থাকিব যে, পুনরায় কখনও অসন্তুষ্ট হইব না।" এই হাদীস সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত আছে।

হযরত ওমর ইব্নে হাযম রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন যে, রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তিন দিন নির্জনবাসে ছিলেন। কেবল ফজর নামাযের সময় তিনি বাহিরে আসিতেন, অন্য সময় তাঁহাকে দেখা যাইত না। চতুর্থ দিনে তিনি বাহিরে আগমন করত বলিলেন–"আমার উম্মতের মধ্যে সত্তর হাজার লোককে বিনা বিচারে বেহেশ্তে প্রবেশের অনুমতি দিবেন বলিয়া আল্লাহ্ তা'আলা আমার সহিত অঙ্গীকার করিয়াছেন। গত তিন দিন (নির্জনবাসের সময়) আমি তদপেক্ষা আরও অধিক চাহিতেছিলাম। আমি আল্লাহ্ তা'আলাকে অত্যন্ত দয়ালু পাইলাম। তাঁহার সর্বব্যাপী অনুগ্রহে তিনি সেই সত্তর হাজার লোকের প্রত্যেকের সঙ্গে সত্তর হাজার করিয়া লোককে বেহেশ্তে যাইবার অনুমতি দিয়াছেন। আমি নিবেদন করিয়াছিলাম–'আমার উম্মত কি এত হইবে?' আল্লাহ্ বলিলেন–'পল্লীবাসীদিগকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া এই সংখ্যা পূর্ণ করিয়া লইতে হইবে।"

বর্ণিত আছে যে, কোনও এক যুদ্ধে বন্দী হইয়া একটি বালক প্রচণ্ড রৌদ্রে ছিল। তাঁবু হইতে জনৈকা মহিলা বালকটিকে দেখিয়া বিহ্বলভাবে তাহার দিকে দৌড়িয়া গেল। তাঁবুর অন্যান্য লোকও তাহার পশ্চাতে ছুটিল। মহিলা বালকটিকে উঠাইয়া কোলে করিয়া লইল এবং তাহাকে প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপ হইতে রক্ষাকল্পে স্বীয় দেহের ছায়া তাহার উপর ফেলিল। মহিলা লোকদিগকে জানাইল যে, বালকটি তাহার পুত্র। ঘটনা দেখিয়া সমবেত লোকগণ রোদন করিতে লাগিল এবং মহিলাটির অপার দয়া দর্শনে তাহারা বিস্মিত হইল। এমন সময় রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণসহ ঘটনাস্থলে আগমন করিলেন। দর্শকগণ কাহিনীটি আদ্যোপান্ত হযরতকে (সা) শুনাইল। তিনি মহিলার দয়া ও লোকদের রোদনের কথা শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন–"তোমরা কি এই মহিলার দয়া ও সন্তান-বাৎসল্য দর্শনে বিস্মিত হইয়াছ?" তাহারা বলিল–"হে আল্লাহ্র রাসূল, আমরা বিস্মিত হইয়াছি।" হযরত (সা) বলিলেন–"এই মহিলা স্বীয় পুত্রের প্রতি যেরূপ দয়ালু, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বান্দার প্রতি তদপেক্ষা অধিক দয়ালু।" এই কথা শ্রবণে মুসলমানগণ আনন্দে বিহ্বল হইয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করিল। এইরূপ আনন্দ তাহারা কখনও অনুভব করে নাই।

হযরত ইব্রাহীম আদহাম (র) বলেন–"এক রজনীতে আমি কা'বাশরীফ তওয়াফের উদ্দেশ্যে একাকী রহিয়া গেলাম। এমন সময় বৃষ্টিপাতও আরম্ভ হইল। আমি আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম–'ইয়া আল্লাহ্, আমাকে পাপ হইতে এমনভাবে রক্ষা কর যে, আমি কোন পাপই না করি।' ইতিমধ্যে কা'বাশরীফ হইতে এক আওয়ায শুনিতে পাইলাম–'তুমি এমন নিষ্পাপ অবস্থা চাহিতেছ যাহাতে পাপ তোমাকে স্পর্শও করিতে না পারে। আমার সকল বান্দা আমার নিকট ইহাই চাহিয়া থাকে। আমি সকলকে পাপ হইতে রক্ষা করিলে আমরা দয়া কাহার উপর প্রকাশ করিব?"

যাহাই হউক, আল্লাহ্র করুণা প্রকাশক তদ্রূপ বহু হাদীস ও উক্তি আছে। প্রবল ভয় যাহাদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে কেবল তাহাদের জন্যই উহা ফলপ্রদ। কিন্তু যাহারা আখিরাতের প্রতি উদাসীন তাহাদের জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, উপরিউক্ত হাদীসসমূহ হইতে ইহাও বুঝা যায় যে, কতক মুসলমান দোযখেও যাইবে এবং সাত হাজার বৎসর শাস্তি ভোগ করিবার পর সর্বশেষ মুসলমান দোযখ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। আর যদি মানিয়াও লওয়া যায়, কেবল একজন লোকই দোযখে যাইবে, তথাপি যে-কোন ব্যক্তির পক্ষে দোযখে যাওয়া সম্ভবপর মনে করিয়া প্রত্যেকেরই পরহেযগারী ও সতর্কতার পন্থা অবলম্বন করিয়া চলা আবশ্যক এবং দোযখ হইতে অব্যাহতি পাইবার আশায় সকল সম্ভবপর সৎকার্য করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। কেননা, সাত হাজার বৎসরকাল অত্যন্ত দীর্ঘ। মাত্র এক রাত্রির দোযখের শাস্তির ভয়ে দুনিয়ার সকল সুখ-সম্ভোগের সামগ্রী পরিত্যাগ করাও সঙ্গত।

মোটের উপর কথা এই যে, মানবের মনে ভয় ও আশা সমান সমান থাকা কর্তব্য; যেমন হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন–"পরকালে কিয়ামতের দিন যদি ঘোষণা করা হয় যে, কেবল এক ব্যক্তি বেহেশ্তে যাইবে, তবে আমি মনে করিব যে, আমিই যাবই। আর যদি ঘোষণা হয় যে, দোযখে একটি মাত্র লোক যাইবে, তবে আমাকেই দোযখে যাইতে হইবে কিনা ভাবিয়া আমার ভয় হইবে।"

ভয়

ভয়ের ফযীলত– ভয় একটি শ্রেষ্ঠ মকাম। ইহার ফল ও উৎপত্তির কারণের অনুরূপই ইহার ফযীলত এবং জ্ঞান ও আল্লাহ্-পরিচয় হইতেই উহা জন্মিয়া থাকে। অতঃপর ইহা ব্যাখ্যা করা হইবে। এইদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই আল্লাহ্

বলেন ঃ إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ – অর্থাৎ "আল্লাহ্‌র বান্দাগণের মধ্যে জ্ঞানিগণ ব্যতীত অপর কেহই তাঁহাকে ভয় করেন না।" (সূরা ফাতির, ৪ রুকূ, ২২ পারা।) রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"আল্লাহ্‌র ভয় সমস্ত জ্ঞানের মূল।" পবিত্রতা, তাকওয়া-পরহেযগারী ভয়ের ফল এবং এই সমস্ত সৌভাগ্যের বীজ। কারণ, প্রবৃত্তি দমন ও ধৈর্য অবলম্বন করিতে না পারিলে পরকালের পথে চলা যায় না। ভয়ের অগ্নি প্রবৃত্তিকে যেমন দগ্ধ করিতে পারে তেমন আর কিছুতেই পারে না। এইজন্যই আল্লাহ্-ভীরু লোককে হেদায়েত, রহমত, ইল্‌ম ও প্রসন্নতা দান করেন বলিয়া আল্লাহ্ তা'আলা তিনটি আয়াতে উল্লেখ করিয়াছেন। আয়াতগুলি এই ঃ

هُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُوْنَ –

অর্থাৎ "হেদায়েত ও রহমত ঐ সকল লোকের জন্য যাহারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে।" (সূরা আ'রাফ, ১৯ রুকূ, ৯ পারা)

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ـ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ –

অর্থাৎ "যাহারা আল্লাহ্‌কে ভয় করিতে থাকে তাহাদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট থাকিবেন এবং তাহারা আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট থাকিবে।" (সূরা বায়্যিনাহ্, ৩০ পারা।) তৃতীয় আয়াতটি হইল পূর্বপৃষ্ঠার আয়াতটি।

আবার ভয় হইতে পরহেযগারী জন্মে এবং ইহা আল্লাহ্ তা'আলা গ্রহণ করেন বলিয়া উল্লেখ করেন; যেমন তিনি বলেন ঃ

وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ –

অর্থাৎ "আল্লাহ্‌র নিকট তোমাদের পরহেযগারী পৌঁছিবে।" (সূরা হজ্ব, ৫ রুকূ, ১৭ পারা।) রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"কিয়ামতের মাঠে সমস্ত মানবকুলকে একত্র করত এমন গুরুগম্ভীর স্বরে এই ঘোষণা করা হইবে যে, দূরে ও নিকটে সর্বত্র লোকে শুনিতে পাইবে–'হে মানবমণ্ডলী, সৃষ্টির দিন হইতে অদ্যাবধি আমি তোমাদের কথা শুনিয়া আসিতেছি, তোমরা আজ আমর কথা শুন। আজ আমি তোমাদের কার্যাবলী

তোমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিব। হে লোকগণ, তোমরা স্বয়ং এক প্রকার কৌলীন্য নির্ধারিত করিয়া লইয়াছ এবং আমি অন্য প্রকার কৌলীন্য স্থিরীকৃত করিয়াছি। তোমরা তোমাদের কৌলীন্যকে উন্নত করিয়াছ এবং আমার নির্ধারিত কৌলীন্যকে তুচ্ছ করিয়াছ। আমি বলিয়াছিলাম–

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقٰكُمْ – অর্থাৎ 'তোমাদের মধ্যে যে-ব্যক্তি পরহেযগার সে আল্লাহ্‌র নিকট তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম কুলীন।' (সূরা হুজুরাত, ২ রুকূ, ২৬ পারা) কিন্তু তোমরা (এইরূপ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠ) বল নাই। বরং তোমরা অমুকের পুত্র বলিয়া অমুককে শ্রেষ্ঠ করিয়াছ। আজ আমি আমার স্থাপিত কৌলীন্যের মর্যাদা দেখাইব এবং তোমাদের নির্ধারিত কৌলীন্যকে তুচ্ছ করিব।' (তৎপর বলা হইবে) 'পরহেযগারগণ (কুলীন) কোথায়?' অনন্তর একটি পতাকা উত্তোলন করা হইবে; আর পরহেযগার ব্যক্তিগণ ইহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিতে থাকিবে। (এইরূপ শোভাযাত্রাসহ) সকল পরহেযগার বিনা-বিচারে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে। এইজন্যই পরহেযগারদের সওয়াব দ্বিগুণ। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتَانِ – অর্থাৎ 'যে ব্যক্ত আল্লাহ্‌র নিকট দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে তাহার জন্য দুই বেহেশ্‌ত।' (সূরা আর-রাহমান, ২ রুকূ, ২৭ পারা)

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ্ বলেন–"আল্লাহ্ স্বীয় গৌরবের শপথ করিয়া বলেন–'দুই ভয় ও দুই নিরুদ্বেগ কোন বান্দার মধ্যে একত্র করিব না। দুনিয়াতে আমাকে ভয় করিলে পরকালে নির্ভয় রাখিব। আর দুনিয়াতে নির্ভর থাকিলে পরকালে ভয়ে নিপতিত রাখিব।" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"যে-ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে, সমস্ত দুনিয়া তাহাকে ভয় করে। আর যে-ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে করে না, সব জিনিসই তাহাকে ভয় প্রদর্শন করে।" তিনি বলেন–"তোমাদের মধ্যে যে-ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে অধিক ভয় করে, সে অধিক বুদ্ধিমান।" তিনি বলেন–মক্ষিকার মস্ত কতুল্য ক্ষুদ্র অশ্রুবিন্দু মুসলমানের চক্ষু হইতে বহির্গত হইয়া গণ্ডস্থলে গড়াইয়া পড়িলে দোযখের অগ্নি সেই মুখমণ্ডল দগ্ধ করিবে না।" তিনি বলেন–"আল্লাহ্‌র ভয়ে যাহার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, তাহার পাপ বৃক্ষ হইতে পক্কপত্রের ন্যায়

ঝরিয়া পড়ে।"তিনি বলেন–"যে-ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে রোদন করে, দোযখে তাহাকে দগ্ধ করা হইবে না।" লোকে রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল–"আপনার উম্মতের মধ্যে কেহ কি বিনা-বিচারে বেহেশ্‌তে যাইবে?" তিনি উত্তরে বলিলেন–"যে-ব্যক্তি স্বীয় পাপ স্মরণ করিয়া রোদন করিবে, সে (বিনাবিচারে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে)।"

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"আল্লাহ্‌র ভয়ে যে অশ্রুবিন্দু চক্ষু হইতে বাহির হয় এবং যে রক্তবিন্দু আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধকালে নির্গত হয়, আল্লাহ্‌র নিকট এই দুই বিন্দু অপেক্ষা অধিক প্রিয় অপর কোন বিন্দু নাই।" তিনি বলেন-"সাত শ্রেণীর কোন স্বয়ং আল্লাহ্‌র ছায়াতলে আশ্রয় পাইবে। যাহারা নির্জনে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং তাহাদের চক্ষু হইতে অশ্রুবিন্দু বাহির হয়, তাহারা তন্মধ্যে এক শ্রেণী।"

হযরত হান্‌যালাহ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন–"আমি রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দরবারে উপস্থিত ছিলাম। তখন হযরত (সা) সমাগত লোকদিগকে উপদেশ দিতেছিলেন। (উপদেশ শ্রবণে) আমাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় প্রবল হইয়া উঠিল এবং চক্ষু হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তৎপর আমি গৃহে গমন করিলাম। আমার পত্নী আমার সহিত বাক্যলাপ করিতে লাগিল। আমি দুনিয়ার কথাবার্তায় লিপ্ত হইয়া গেলাম। (এমন সময়) হযরতের (সা) উপদেশ এবং আমার রোদনের কথা মনে পড়িল। আমি গৃহ হইতে বাহির হইলাম এবং চিৎকার ও বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিলাম 'হায়! হান্‌যালাহ মুনাফিক (কপট) হইয়া গিয়াছে।' হযরত আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন–'মুনাফিক হয় নাই।" তৎপর আমি হযরতের (সা) দরবারে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলাম–"হে আল্লাহ্‌র রাসূল, হান্‌যালাহ মুনাফিক হইয়া গিয়াছে।' হযরত (সা) বলিলেন–كَلَّالَمْ مُنَافِقْ حَنْظَلَةُ (অর্থাৎ হান্‌যালাহ্‌ কখনও মুনাফিক হয় নাই।) ইহার পর আমার সকল অবস্থা তাঁহাকে জানাইলাম। হযরত (সা) বলিলেন–'হে হান্‌যালাহ, আমার নিকট আসিলে তোমাদের যেরূপ অবস্থা হয়, সেই অবস্থা সর্বদা থাকিলে ফিরিশতাগণ তোমাদের গৃহে যাইয়া এবং রাস্তায় পাইলে তোমাদের সহিত মুসাফাহাহ (করমর্দন) করিত। হে হান্‌যালাহ্‌, ঐরূপ অবস্থা অল্পক্ষণই থাকে।"

ভয়ের ফযীলত সম্বন্ধে বুযুর্গগণের উক্তি– হযরত শিবলী (র) বলেন– "যে দিনই আমার হৃদয়ে আল্লাহ্‌র ভয় প্রবল হইয়া উঠিত, সেই দিনই আমার অন্তরে হিকমতের নতুন পথ খুলিয়া যাইত এবং আমার উপদেশ গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইত।" হযরত ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌নে মু'আয (র) বলেন–"দুইটি ব্যাঘ্রের মধ্যস্থলে একটি শৃগাল থাকিলে ইহার অবস্থা যেরূপ হয়, পরকালে শাস্তির ভয় ও আল্লাহ্‌র রহমতের আশার মধ্যস্থলে মুসলমানের পাপের অবস্থা তদ্রূপ হইয়া থাকে।" তিনি অন্যত্র বলেন– 'দরিদ্রতাকে মানুষ যেরূপ ভয় করে, দোযখকে তদ্রূপ ভয় করিলে সে অবশ্যই বেহেশ্‌তী হইত।" লোকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল–"কিয়ামতের দিন কোন্‌ ব্যক্তি অধিক নিরাপদে থাকিবে?" তিনি বলিলেন–"যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আল্লাহকে অধিক ভয় করে।" এক ব্যক্তি হযরত হাসান বসরীকে (র) জিজ্ঞাসা করিল–"যাঁহারা আল্লাহ্‌র এত অধিক ভয় দেখাইয়া থাকেন যে, হৃদয় টুকরা টুকরা হইয়া যায়, তাঁহাদের সাহচর্য অবলম্বন সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?" তিনি বলিলেন–"যাঁহারা তোমাকে তদ্রূপ ভয় প্রদর্শন করেন, দুনিয়াতে তাঁহাদের সংসর্গেই থাক;' তাহা হইলে পরকালে নির্ভয়ে থাকিবে। যাহারা তোমাকে এ দুনিয়াতে ভয়শূন্য রাখে, অথচ তজ্জন্য তোমাকে পরকালে ভয়ে পতিত হইতে হইবে, এমন লোকের সাহচর্য অপেক্ষা ভয়প্রদর্শক লোকের সংসর্গ বহুগুণে উৎকৃষ্ট।" হযরত আবূ সুলায়মান দারানী (র) বলেন– "যে হৃদয়ে আল্লাহ্‌র ভয় নাই, তাহা উজার হইয়া গিয়াছে।"

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট নিবেদন করেন– "কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌ যে বলেনঃ وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَا اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ – (যাহারা কার্য করে, অথচ আল্লাহ্‌কে ভয় করে)-এই কথা কি চুরি ও ব্যভিচার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে?" হযরত (সা) বলিলেন–"ঐ সকল কাজ (চুরি ও ব্যভিচার নহে, বরং) নামায, রোযা ও সদ্‌কা। বান্দা এই সমস্ত কাজ করিয়া আল্লাহ গ্রহণ করিবেন কিনা ভাবিয়া ভয় করিয়া থাকে।" হযরত মুহাম্মদ ইব্‌নে মুনকাদির (র) রোদন করত অশ্রু বদনমণ্ডলে লেপিয়া রাখিতেন এবং বলিতেন– "আমি শুনিয়াছি যেস্থান অশ্রুতে ভিজে তাহা দোযখের আগুনে জ্বলিবে না।" হযরত আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন–"রোদন কর। রোদন করিতে না পারিলে রোদনের

ভান কর।" হযরত কা'বুল আহ্‌বার রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন–"সহস্র স্বর্ণমুদ্রা সদকা করা অপেক্ষা রোদন করত বদনমণ্ডল অশ্রুসিক্ত করাকে আমি অধিক মূল্যবান মনে করি।"

ভয়ের পরিচয়–অন্তরের এক বিশেষ অবস্থাকে ভয় বলে। ইহা হৃদয়ে উদ্ভূত অগ্নিসদৃশ। উহার উৎপত্তির যেমন কারণ আছে তদ্রূপ উহার বিশেষ ফলও আছে।

ভয় উৎপত্তির কারণ-ইলম (জ্ঞান) ও মা'রিফাত (তত্ত্ব পরিচয়) হইতে ভয় জন্মে। মানুষ যখন পরকালের পথের বিপদ দেখিতে পায় এবং তাহার বিনাশের বর্তমান ও ভবিষ্যত উপকরণসমূহের প্রতি লক্ষ্য করে তখন বাধ্য হইয়াই তাহার অন্তরে ভয়ের অগ্নি জ্বলিয়া উঠে। ইহা দুই প্রকার পরিচয় জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

প্রথম–স্বীয় পাপ, দোষ, ইবাদতের আপদ, স্বভাবের জঘন্যতা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিয়া লওয়া এবং সমস্ত দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও নিজের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার অনন্ত দয়া ও অযাচিত দানের দিকে লক্ষ্য করা। ইহার দৃষ্টান্ত এইরূপ যে, মনে কর এক ব্যক্তি বাদশাহ্‌র নিকট হইতে বহু পুরস্কার ও উপঢৌকন লাভ করিল। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও সে বাদশাহ্‌র অন্তঃপুরে অপব্যবহার, ধন-ভান্ডার অপহরণ ইত্যাদি আরম্ভ করিয়া দিল। তৎপর সে হঠাৎ একদিন জানিতে পারিল যে, বাদশাহ তাহার অপকর্ম স্বচক্ষে দেখিতেছেন এবং তিনি অত্যন্ত আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, শ্রেষ্ঠ প্রতিশোধগ্রহণকারী ও অসীম প্রতাপশালী অথচ বাদশাহ্‌র নিকট তাহার জন্য অনুরোধ করিবারও কেহ নাই, বাদশাহ্‌র সহিত কোন সম্বন্ধও নাই বা সে তাহার নৈকট্যও লাভ করিতে পারে নাই। এমতাবস্থায় সে যখন তাহার অপকর্মের বিপদ বুঝিতে পারিবে তখন তাহার হৃদয়ে ভয় ও যন্ত্রণার অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে।

দ্বিতীয়–নিজের পাপ ও দোষক্রটির প্রতি লক্ষ্য করত ভীত না হইয়া বরং আল্লাহ্‌র প্রবল প্রতাপ ও অপ্রতিহত শক্তির কারণে অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হওয়া। যেমন মনে কর, এক ব্যক্তি ব্যাঘ্রে পরিপূর্ণ এক ভীষণ জঙ্গলে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। এমতাবস্থায় সে স্বীয় পাপ স্মরণ করিয়া ভীত হইবে না, বরং এ-কথা চিন্তা করিয়া ভীত হইবে যে, মানুষ মারিয়া ফেলাই ব্যাঘ্রের স্বভাব এবং তাহার অসহায় অবস্থার প্রতি ব্যাঘ্র মোটেই লক্ষ্য করিবে না। এই প্রকার ভয়

পূর্বোক্ত ভয় অপেক্ষা পূর্ণ ও উৎকৃষ্ট। এইজন্যই যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র গুণাবলী, শ্রেষ্ঠত্ব ও শক্তি অবগত হইয়াছে, বুঝিতে পারিয়াছে যে, বিশ্বজগত বিনাশ করিয়া চিরকালের জন্য দোযখে নিক্ষেপ করিলেও তাঁহার রাজ্যের বিন্দুমাত্র হ্রাস পাইবে না এবং ভালরূপে জানিয়া লইয়াছে যে, তিনি মানবীয় স্নেহ-মমতাদির বহু ঊর্ধ্বে, তবে মানবের মনে ভয় ও ত্রাসের সঞ্চার না হইয়া পারে না। পয়গম্বরগণের হৃদয়ও এইরূপ ভয়ে পরিপূর্ণ ছিল। অথচ তাঁহারা জানিতেন যে, তাঁহারা নিষ্পাপ। বরং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে অধিক চিনিতে পারিয়াছে তাহার ভয়ও তত অধিক। এই কারণেই রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"আমি অধিক জানি বলিয়াই অধিক ভয় করি।"

আর এইজন্যই আল্লাহ্ বলেন ঃ

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ –

অর্থাৎ "আল্লাহ্‌র বান্দাগণের মধ্যে আলিমগণ ব্যতীত অন্য কেহই তাঁহাকে ভয় করে না।" অপরপক্ষে যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্বন্ধে যত অল্প জানে, সে তত নির্ভয় হইয়া থাকে। হযরত দাউদ আলায়হিস্ সালামের উপর ওহী অবতীর্ণ হইল–"হে দাউদ উত্তেজিত ব্যাঘ্রকে যেমন ভয় কর, আমাকে তদ্রূপ ভয় কর।

ভয়ের ফল ও প্রকাশ– উপরে ভয়ের উৎপত্তির কারণ বর্ণিত হইল। এখন ইহার ফল সম্বন্ধে বলা হইবে। ভয়ের ফল হৃদয়, শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রকাশ পায়। ইহা হৃদয়ে প্রকাশ পাইলে দুনিয়ার লোভ-লালসা মন্দ বলিয়া মনে হয় ও কামনা লুপ্ত হয়। যাহার মনে বিবাহের কামনা বা আহারের ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, সে ব্যাঘ্র পরিপূর্ণ কোন বনে আটকা পড়িলে বা কোন দুর্দান্ত নরপতির কারাগারে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে যেমন তাহার সকল অভিলাষ লুপ্ত হইয়া যায়, যাহার অন্তরে ভয়ের ফল প্রকাশিত হয়, তাহার অবস্থাও তদ্রূপ হইয়া পড়ে। ভয় তখন তাহার হৃদয়ে দীনতা আনিয়া দেয় এবং সে পার্থিব সকল বিষয় ভুলিয়া সর্বান্তঃকরণে কৃতকর্মের হিসাব-নিকাশ ও পরিণাম চিন্তায় ব্যাপৃত হয়। সেই সময় অহংকার, ঈর্ষা, দুনিয়ার লোভ-লালসা, মোহ প্রভৃতি তাহার অন্তরে স্থান পায় না। ভয়ের ফল শরীরে প্রকাশ পাইলে অবসন্নতা ও দুর্বলতা বৃদ্ধি পায় এবং শরীর পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করে। ভয়ের ফল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রকাশ পাইলে এইগুলি আর পাপকার্যে অগ্রসর হইতে পারে না এবং যথারীতি ইবাদতে প্রবৃত্তও থাকে।

অবস্থাভেদে ভয়ের নামকরণ–অবস্থাভেদে ভয় বিভিন্ন প্রকার। যে ভয় মানুষকে কামনা-প্রবৃত্তি হইতে বাঁচাইয়া রাখে, তাহাকে ইফ্ফত (পবিত্রতা) বলে এবং যাহা হারাম হইতে রক্ষা করে তাহাকে অরা' (পাপভয়) বলে। আবার যে ভয় সন্দেহযুক্ত বিষয় বা বস্তু হইতে দূরে রাখে, তাহার নাম তাকওয়া (পরহেযগারী)। যাহা মানুষকে অভাব-মোচনের পরিমিত পাথেয় ব্যতীত তদতিরিক্ত প্রত্যেক বস্তু পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করে, তাহাকে সিদ্‌ক বলে। ইফ্ফত ও অরা' তাক্‌ওয়ার অন্তর্গত এবং এই সমস্তই সিদ্‌ক অপেক্ষা নিকৃষ্ট। অপরপক্ষে যে ভয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়, কিন্তু পরক্ষণেই মানুষ চক্ষু মুছিয়া لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ – (আল্লাহ্‌র সাহায্য ব্যতীত কেহই পাপ হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে না।) পড়িয়া মোহাচ্ছন্ন-অবস্থায় অন্যায় কার্যে প্রবৃত্ত হয়, এমন ভয়কে ভয় বলা চলে না। ইহা নারীসুলভ উচ্ছ্বাস। কারণ, ভয়ের বিষয় হইতে মানুষ ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করে এবং ইহার ত্রিসীমায়ও আর আসে না। আস্তিনে সাপ লুকাইয়া আছে দেখিয়া কেহই – لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ পড়িয়া নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া থাকিতে পারে না, বরং বস্ত্র হইতে তৎক্ষণাৎ সাপ ঝাড়িয়া ফেলিয়া দেয়। হযরত যুন্নুন মিসরী (র) কে লোকে জিজ্ঞাসা করিল– "কোন্ ব্যক্তি বাস্তবিক ভীত?" তিনি বলিলেন– "পীড়িত ব্যক্তি যেমন মৃত্যুর ভয়ে ক্ষতিকর লোভনীয় বস্তু পরিত্যাগ করে তদ্রূপ যে ব্যক্তি পাপ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে, সেই-ই প্রকৃত ভয় করিয়া থাকে।"

ভয়ের শ্রেণীবিভাগ–ভয় তিন শ্রেণীতে বিভক্ত— দুর্বল, প্রবল ও মধ্যম। তন্মধ্যে মধ্যম শ্রেণীর ভয় উত্তম। যে ভয় স্ত্রী-জনোচিত উচ্ছ্বাসের ন্যায়, পরক্ষণেই লোপ পায় এবং মানুষকে কর্তব্যকর্মে রত রাখে না, ইহাই দুর্বল ভয়। যে ভয় মানুষকে হতাশ, অজ্ঞান ও পীড়িত করিয়া ফেলে এবং মৃত্যুর ভয়ে সর্বদা অস্থির রাখে, ইহাকে প্রবল ভয় বলে। দুর্বল ও প্রবল এই উভয় প্রকার ভয়ই মন্দ। তাওহীদ, মা'রিফাত ও মহব্বতের ন্যায় ভয় স্বয়ং মানুষের কাম্য গুণ নহে, কেননা ইহা আল্লাহ্‌র গুণরাজির অন্তর্ভুক্ত নয়। অজ্ঞানতা ও দুর্বলতা না থাকিলে ভয় জন্মিতে পারে না। কারণ, পরিণাম অজ্ঞাত থাকিলে এবং বিপদ পরিহারে অক্ষম হইলে অন্তরে ভয় জন্মে। কিন্তু কর্তব্যকর্মে উদাসীন লোকদের পক্ষে ভয় অবশ্যই একটি গুণ। কারণ, ভয় চাবুক্‌সদৃশ যাহা দ্বারা দুষ্ট বালককে বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত করা যায় এবং চতুষ্পদ জন্তুকে রাস্তায় পরিচালনা করা চলে।

কিন্তু চাবুক যদি এত ক্ষীণ হয় যে, প্রহার না লাগে তবে ইহা দ্বারা অমনোযোগী বালককে পাঠে রত করিতে বা হঠকারী জন্তুকে চালাইতে পারা যায় না। আবার চাবুক যদি এত শক্ত হয় যে, ইহার আঘাতে বালক বা জন্তুর শরীর যখম হইয়া পড়ে; মুখ, হস্তপদ ভাঙ্গিয়া যায়, তবে ইহাও কাজের উপযোগী নহে। তাই চাবুক মধ্যম রকমের হওয়া উচিত এবং ভয়ও তদ্রূপ মধ্যম প্রকারের হওয়া কর্তব্য। মধ্যম প্রকারের ভয় মানুষকে পাপ হইতে বিরত রাখে এবং ইবাদতে উৎসাহ জন্মায়। যাহার ইলম যত বেশী, তাহার ভয়ও তত মধ্যম অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কারণ, মধ্যম অবস্থা অতিক্রম করিয়া যখনই ভয় বৃদ্ধি পাইতে থাকে, আলিম ব্যক্তি তখনই আল্লাহ্‌র রহমতের দিকে মনোনিবেশ করে এবং ভয় হ্রাস পাইলে কর্তব্যকর্মের ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া ভীত হয়।

অপরপক্ষে যে ব্যক্তি আল্লাহ্-ভীরু নহে, অথচ নিজেকে আলিম বলিয়া দাবী করে, সে আলিম নহে। সে যাহা কিছু শিখিয়াছে, তাহা ইলম নহে, বরং নিরর্থক বেহুদা পদার্থ। এইরূপ লোক ভিক্ষাজীবী জ্যোতিষগণক তুল্য। গণকগণ অদৃষ্ট সম্বন্ধে জানে বলিয়া দাবী করে, কিন্তু এই সম্বন্ধে তাহারা বিন্দুবিসর্গও অবগত নহে।

নিজের ও আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয় লাভ করা; নিজেকে আপাদমস্তক ত্রুটিপূর্ণ এবং আল্লাহ্‌কে পূর্ণ প্রতাপশালী, অসীম ক্ষমতাশালী মনে করা ও তিনি বিশ্বজগতকে নিমিষের মধ্যে বিনাশ করিয়া দিতে পারেন বলিয়া বিশ্বাস করাই সকল জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। এই দুই প্রকার জ্ঞানে কেবল ভয় ব্যতীত অন্য কোন মানসিক অবস্থার উদ্ভব হয় না। এইজন্যই রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

اَوَّلُ الْعِلْمِ مَعْرِفَةُ الْجَبَّارِ وَاٰخِرُ الْعِلْمِ تَفْرِيْضُ الْاَمْرِ اِلَيْهِ –

অর্থাৎ "প্রচণ্ড প্রতাপশালী আল্লাহকে জানা প্রথম জ্ঞান এবং সকল কাজই তাঁহার উপর ন্যস্ত করিয়া দেওয়া শেষ জ্ঞান।" অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে অপ্রতিহত প্রতাপশালী এবং কঠিন শাস্তিদাতা বলিয়া বিশ্বাস করা, আর বান্দা নিজে কিছুই নহে ও তাহা দ্বারা কোন কার্য সম্পন্ন হয় না ভাবিয়া নিজের সমস্ত কাজ তাঁহার উপর ন্যস্ত করিয়া দিলেই পূর্ণ জ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে। এইরূপ জ্ঞান লাভ করিলে মানব কিরূপে নির্ভর চিত্তে থাকিতে পারে?

ভয়ের প্রকারভেদ–বিপদ বুঝিতে পারিলে ভয় জন্মে এবং সকলের ভয় এক

প্রকার হয় না। কেহ দোযখের ভয়ে ভীত হয়, আবার কেহবা এমন পদার্থের জন্য ভীত হয়, যাহা তাহাকে দোযখে লইয়া যাইতে পারে। যেমন, বিনা-তওবায় মৃত্যু ঘটিতে পারে বলিয়া কেহ ভীত হয়, আবার কেহবা তওবার পর পুনরায় পাপে লিপ্ত হইবার ভয়ে শঙ্কিত থাকে। কেহ স্বীয় হৃদয় মোহাচ্ছন্ন ও কঠিন হইতে পারে বলিয়া ভয় করে। নিজের কুঅভ্যাস তাহাকে পাপের দিকে আকর্ষণ করিতে পারে বা পার্থিব ধনসম্পদের কারণে তাহার অন্তরে অহংকার প্রবল হইয়া উঠিতে পারে বলিয়া কেহ ভয় পায়। ইহজগতের যাহাদের উপর অবিচার-অত্যাচার করা হইয়াছে, পরকালে বিচারের দিন তজ্জন্য ধরা পড়িবার শঙ্কায় কেহ সন্ত্রস্ত হয়। নিজের দোষ ও পাপ কিয়ামতের দিন প্রকাশ পাইলে লোকচক্ষে হেয় হইবার ভয়ে কেহ ভীত হয়। কেহবা আবার তাহার মনে যে চিন্তা উদয় হইতেছে, ইহা আল্লাহ্‌র নিকট মন্দ এবং তিনি সবই জানিতেছেন ও দেখিতেছেন ভাবিয়া ভীত হয়। এইরূপ বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে লোকের মনে ভয় জন্মিয়া থাকে। সুতরাং যে বিষয়ের জন্য ভয় জন্মে, তাহা পরিত্যাগ করাই সকলের পক্ষে মঙ্গলজনক। যেমন, কুঅভ্যাস পুনরায় পাপের দিকে টানিয়া লইতে পারে বলিয়া ভয় হইলে এইরূপ অভ্যাস সযত্নে পরিহার করা উচিত। মনে উদিত অপ্রিয় চিন্তা আল্লাহ্ জানিতে পারেন বলিয়া ভয় জন্মিলে তদ্রূপ চিন্তা হইতে অন্তর পবিত্র রাখা আবশ্যক। এবংবিধ অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধেও এইরূপই বুঝিয়া লওয়া উচিত।

অধিকাংশ লোকের ভয়ের স্বরূপ–মৃত্যুকালে ঈমান লইয়া মরিতে পারিবে কিনা এবং পরিণাম কিরূপ হইবে, এই ভয় প্রবল হওয়ার কারণে অধিকাংশ লোক ভীত-সন্ত্রস্ত হয়। কিন্তু ইহা অপেক্ষা উচ্চাঙ্গের ভয় হইল সৃষ্টির প্রারম্ভে অদৃষ্টে কি লিপিবদ্ধ হইয়াছে–সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য লিখিত হইয়াছে, এই ভয়ে ভীত হওয়া। কেননা, সেই সময় যেরূপ লিপিবদ্ধ হইয়াছে–তদনুরূপই মৃত্যু ঘটিবে। ইহার মূল এই যে, একদা রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মিম্বরে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন–"আল্লাহ্ তা'আলা এক কিতাব লিখিয়াছেন, ইহাতে বেহেশ্‌তী লোকের নাম লিপিবদ্ধ আছে।" এই কথা বলিয়া হযরত (সা) স্বীয় দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিলেন। তৎপর তিনি বলিলেন–"আল্লাহ্ তা'আলা আর একটি কিতাব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, ইহাতে দোযখী লোকের নাম ও ঠিকানা লিখিত আছে।" তৎপর হযরত (সা) স্বীয় বাম হস্ত উত্তোলন করিলেন এবং বলিলেন–"ইহাতে কোন হ্রাস বা বৃদ্ধি হইবে না।"

(অর্থাৎ আল্লাহ্ যেরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তদ্রূপই ঘটিবে।) ইহা অসম্ভব নহে যে, বেহেশ্‌তী লোকের অন্তর্ভুক্ত কোন ব্যক্তি দোযখী লোকের কার্য করিতে থাকিবে, এমনকি সকলেই তাহাকে দোযখী বলিয়া মনে করিবে। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে দুর্ভাগ্যের পথ হইতে সৌভাগ্যের পথে ফিরাইয়া লইবেন।"

বাস্তবপক্ষে সৃষ্টির প্রারম্ভে যাহার ভাগ্যে সৌভাগ্য দেখা হইয়াছে সেই ব্যক্তিই ভাগ্যবান এবং যাহার ভাগ্যে দুর্ভাগ্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে সেই ব্যক্তিই হতভাগ্য। অন্তিম অবস্থার অনুরূপ পারলৌকিক অবস্থা হইবে। (অর্থাৎ ঈমানের সহিত মরিলে সৌভাগ্যবান, আর বেঈমান হইয়া মরিলে হতভাগ্য।) এইজন্যই আরিফগণ ভয় করিয়া থাকেন এবং ইহাই পূর্ণাঙ্গ ভয়। আল্লাহ্ তা'আলার অপ্রতিহত প্রভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যে ভয় জন্মে, ইহা যেমন স্বীয় পাপের কারণে উদ্ভূত ভয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আরিফগণের ভয়ও তদ্রূপ শ্রেষ্ঠ। কারণ, আল্লাহ্‌র প্রতাপ-চিন্তা-সম্ভূত ভয় কখনও লোপ পায় না। অপরপক্ষে কেবল পাপের দরুনই ভীত হইয়া থাকিলে পাপী ব্যক্তি তওবা করত গর্বিত হইয়া বলিতে পারে–"আমি ত এখন পাপকর্ম পরিত্যাগ করিয়াছি, আর ভয় কিসের?"

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত দাঊদ আলায়হিস্ সালামকে বলিয়াছিলেন–"হে দাঊদ, ভয়ংকর ব্যাঘ্রকে যেরূপ ভয় কর, আমাকেও তদ্রূপ ভয় কর।" এই কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, সংহার কার্যে ব্যাঘ্রের কোন বিঘ্ন ঘটে না।

অশুভ মৃত্যু-ভয়–সাধারণত ধর্মভীরু লোক অন্তিমকালের ভয়েই ভীত থাকে। কারণ, মানব-মন পরিবর্তনশীল, এক অবস্থায় স্থির থাকে না এবং মৃত্যু-সময় বড় কঠিন। সেই সময় মনের অবস্থা কিরূপ হইবে, কেহই বলিতে পারে না। এক আরিফ (র) বলেন– "কোন ব্যক্তিকে আমি পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত তাওহীদের বিশ্বাসী বলিয়া জানিলেও সে ক্ষণকালের জন্য আমা হইতে প্রাচীরের অন্তরালে চলিয়া গেলে আমি তাহাকে তাওহীদে বিশ্বাসী বলিয়া সাক্ষ্য দিব না। কেননা মানসিক অবস্থার প্রতিমহূর্তে পরিবর্তন হইতে থাকে।" অপর এক আরিফ বলেন–"আমাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে যে, বাড়ীর বহির্দ্বার ও বাসগৃহের দরজা, এই দুইটির কোন্ স্থানে মরিলে তুমি ঈমানের সহিত মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া সাক্ষ্য দিতে পছন্দ কর, তবে আমি বাসগৃহের দরজার কথা বলিব। কারণ, বহির্দ্বার পর্যন্ত যাইতে ঈমান থাকিবে কিনা, বলিতে পারি না।" হযরত আবূ দরদা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু শপথ করিয়া বলিতেন–"মৃত্যুকালে ঈমান

হারাইয়া যাইতে পারে, এই ভয় হইতে কেহই নিশ্চিন্ত হইতে পারে না।" হযরত সহল তস্তরী (র) বলেন–"মৃত্যুর সময় ঈমান হারাইয়া যাইতে পারে, এই ভয়ে সিদ্দীকগণ সর্বদা ভীত থাকেন।" হযরত সুফিয়ান সাওরী (র) আন্তিমকালে অধীরভাবে রোদন করিতেছিলেন। লোকে প্রবোধ দিয়া বলিতেছিল–"আপনি রোদন করিবেন না। আল্লাহ্‌র দয়া আপনার পাপ অপেক্ষা অধিক।" উত্তরে তিনি বলিলেন– "আমি যদি বুঝিতে পারি, যে ঈমানের সহিত আমার মৃত্যু হইবে তবে পাহাড় পরিমাণ পাপ থাকিলেও আমি মোটেই ভয় করি না।"

এক বুযুর্গ এক ব্যক্তির হস্তে তাঁহার সমস্ত ধন সমর্পণপূর্বক অন্তিম অনুরোধ জানাইলেন–"ঈমানের সহিত আমার মৃত্যু হইলে অমুক নিদর্শন দেখিতে পাইবে। এই নিদর্শন দেখিলে এই ধন দ্বারা চিনি ও বাদাম খরিদ করত শহরের বালকের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিও এবং বলিও ইহা অমুকের আনন্দোৎসব, কারণ সে ঈমান লইয়া মরিয়া গিয়াছে। আর মৃত্যুসময়ে সেই চিহ্ন দেখিতে না পাইলে লোকদিগকে আমার জানাযার নামায পড়িতে নিষেধ করিও, মৃত্যুর পরে আমা দ্বারা লোকে প্রতারিত না হয় এবং আমি রিয়াকার না হই।" হযরত সহল তস্তরী (র) বলেন– "মুরীদের পক্ষে পাপে পতিত হইবার ভয় আছে, কিন্তু আরিফ মুরশিদের পক্ষে কাফির হইবার ভয় থাকে।" হযরত বায়েযীদ বুস্তামী (র) বলেন–"আমি মসজিদে যাইবার সময় আমার কোমরে একটি পৈতা দেখিতে পাই, অর্থাৎ আমার ভয় হয় যে, মসজিদে যাইবার পরিবর্তে মন্দিরে গিয়া প্রবেশ করি কিনা। প্রত্যহ পাঁচবার আমার মনের অবস্থা এইরূপই হইয়া থাকে।"

হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম স্বীয় সহচরকে বলিলেন–"তোমরা পাপের ভয় কর, কিন্তু আমরা (পয়গম্বরগণ) কুফরের ভয় করি।" একজন পয়গম্বর (আ) কয়েক বৎসর অন্নবস্ত্রের অভাবে অত্যন্ত কষ্টভোগ করিয়াছিলেন। দুঃখে জর্জরিত হইয়া অবশেষে তিনি রোদন করত আল্লাহ্‌র দরবারে ফরিয়াদ করিলেন। ওহী আসিল–"আমি তোমাদের হৃদয়কে কুফ্‌র (নাস্তিকতা) হইতে রক্ষা করিয়াছি। ইহাতে কি তুমি সন্তুষ্ট নও যে, তুমি দুনিয়া চাহিতেছ?" তিনি নিবেদন করিলেন–"ইহা আল্লাহ্, আমি তওবা করিলাম এবং সন্তুষ্ট হইলাম।" তৎপর সেই ফরিয়াদের জন্য মর্মাহত হইয়া তিনি স্বীয় মস্তকে ধূলি নিক্ষেপ করিলেন।

ঈমান হারাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবার অন্যতম কারণ কপটতা। এইজন্যই সাহাবাগণ (রা) সর্বদা কপটতার জন্য ভয় করিতেন। হযরত হাসান

বস্‌রী (র) বলেন–"আমি যদি জানিতাম যে, আমার কপটতা নাই তবে সমস্ত বিশ্বজগতের ধনসম্পদ অপেক্ষা আমি ইহাকে অধিক ভালবাসিতাম।" তিনি অন্যত্র বলেন–"অন্তরে-বাহিরে এবং মনে-মুখে পার্থক্য হওয়াও কপটতার অন্তর্ভুক্ত।

অন্তিমকালে ঈমান হারাইবার কারণ–মৃত্যুকালে ঈমান লোপ পায় কি না, এই ভয়েই সকল বুযুর্গ ভীত থাকেন। ইমান লোপ পাইবার বহু গুপ্ত রহস্য আছে। কিন্তু সচরাচর দুইটি কারণে ঈমান নষ্ট হইয়া থাকে।

প্রথম কারণ–কোন বাতিল ও বিদ'আতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করত তদনুযায়ী সমস্ত জীবন অতিবাহিত করা এবং এইরূপ আকীদাকে ভুল বলিয়া মনে না করা। তদ্রূপ ভুল বিশ্বাস অনুযায়ী যে ব্যক্তি জীবন যাপন করিতেছে, আল্লাহ তা'আলা হয়ত মৃত্যুকালে তাহার ভুল ভাঙ্গিয়া দিবেন এবং তজ্জন্য তাহার মূল ধর্ম-বিশ্বাসেও সন্দেহের উদ্রেক হইতে পারে। তদ্রূপ বিপত্তি ঘটিলে মূল ধর্ম-বিশ্বাস দুর্বল হইয়া পড়ে এবং ফলে সন্দিগ্ধ ঈমান লইয়া মরিতে হয়। ঈমান বিনষ্ট হওয়ার এইরূপ আশা দুই শ্রেণীর লোকের জন্য রহিয়াছে। যথাঃ– –(১) বিদ'আতী লোক। (২) ইল্‌মেকালামে অভিজ্ঞ যে ব্যক্তি সর্বদা যুক্তি-তর্কের পথই অবলম্বন করিয়া চলে। তাহারা পরহেযগার হইলেও ঈমান হারাইবার তদ্রূপ আশঙ্কা আছে। (ইসলামের ধর্ম-বিশ্বাসগুলিকে যে বিদ্যার সাহায্যে যুক্তি-তর্ক দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া যায়, ইহাকে ইলমে কালাম বলে।) কিন্তু যে সকল সরল প্রকৃতির লোক কুরআন-হাদীসের প্রকাশ্য নির্দেশ মানিয়া চলে, তাহাদের পক্ষে ঈমান নষ্ট হওয়ার তদ্রূপ আশঙ্কা নাই। এইজন্য রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–

عَلَيْكُمْ بِدِيْنِ الْعَجَائِزِ وَاَكْثَرُ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْبُلْهُ –

অর্থাৎ "বৃদ্ধ মহিলাগণ যেমন দলিল-প্রমাণ ব্যতীত বিশ্বাস করিয়া লয়, তোমাদের পক্ষেও হাদীসের কথা তদ্রূপ বিনা-প্রমাণেই বিশ্বাস করিয়া লওয়া উচিত। অধিকাংশ বেহেশ্‌তবাসীই সোজা সরল প্রকৃতির লোক হইবে।" এই কারণেই পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ তর্কবিতর্ক দ্বারা ধর্মকর্মের হাকীকত নির্ধারণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কেননা, তাঁহারা বুঝিতেন, যে-সে লোকের মধ্যে এইরূপ তর্কবিতর্কের ক্ষমতা থাকে না, তর্কবিতর্কে প্রবৃত্ত হইলে অবশ্যই বিদ'আত কার্যে লিপ্ত হইয়া পড়িবে।

দ্বিতীয় কারণ–বাস্তবপক্ষে অধিকাংশ লোকের ঈমান দুর্বল এবং সংসারাসক্তি প্রবল থাকে। এমতাবস্থায় মৃত্যু উপস্থিত হইলে মানুষ দেখিতে পায় যে, সংসারের সমস্ত ভালবাসার বস্তু তাহার নিকট হইতে জোরজবরদস্তি কাড়িয়া লওয়া হইতেছে এবং দুনিয়া হইতে তাহাকে বলপ্রয়োগে এমন স্থানে লইয়া যাওয়া হইতেছে যেখানে যাইতে তাহার মন চায় না। এই কারণে তখন মনে এক প্রকার বিতৃষ্ণা জাগিয়া উঠে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি যে দুর্বল ভালবাসাটুকু ছিল তাহা লোপ পায়। মনে কর, কোন ব্যক্তি স্বীয় সন্তানকে ভালবাসে। কিন্তু সন্তান যদি তাহা অপেক্ষা অধিক প্রিয় কোন বস্তু কাড়িয়া লইতে উদ্যত হয়, তবে সেই ব্যক্তি সন্তানকে দুশমন জ্ঞান করে এবং সন্তানের প্রতি যে সামান্য ভালবাসাটুকু ছিল তাহা আর থাকে না। এইজন্যই শহীদের এত বড় মরতবা। কেননা, সেইব্যক্তি তখন মন হইতে দুনিয়া সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত করত একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ভালবাসার পূর্ণ উচ্ছ্বাস হৃদয়ে লইয়া ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং মনেপ্রাণে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকেন। সেই সময় মৃত্যুর আগমন পরম সৌভাগ্যের বিষয়। কারণ, অন্তরের তদ্রূপ অবস্থা বেশীক্ষণ থাকে না, শীঘ্রই মনের সেই ভাব পরিবর্তিত হইয়া পরে।

আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসার পরিণাম–যাহার অন্তরে আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসা অন্যান্য সকল পদার্থের ভালবাসা অপেক্ষা অধিক, সেই ব্যক্তি নিজকে নিজে একেবারে সংসারের দিকে ছাড়িয়া দিতে পারে না, আল্লাহ্ তাহাকে ইহা হইতে বাঁচাইয়া রাখেন। এমন ব্যক্তি মৃত্যুকালে ঈমান হারাইবার ভয় হইতে নিরাপদে থাকে এবং মৃত্যুকালে স্বীয় প্রিয়তমের সহিত মিলিত হইবার উপায় মনে করিয়া আনন্দিত হয়। তখন মৃত্যুকে অপ্রিয় বলিয়া মনে হয় না। আল্লাহ্‌র ভালবাসা তাহার হৃদয়ে অধিকতর প্রবল হইয়া উঠে এবং দুনিয়ার মহব্বত সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ইহাই খাতিমা বিল খায়র অর্থাৎ শুভ-মৃত্যুর নির্দশন।

অশুভ মৃত্যু হইতে মুক্তিলাভের উপায়–যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে ঈমান হারাইবার ভয় হইতে পরিত্রাণ পাইতে চায়, তাহাকে বিদ'আত হইতে বহু দূরে থাকিতে হইবে এবং কুরআন-হাদীসের কথা সর্বান্তঃকরণে মানিয়া লইতে হইবে। তন্মধ্যে যে কথার অর্থ বুঝিতে পারা যায়, তাহা প্রাণপণে মযবুত করিয়া ধরিতে হইবে এবং যাহা বুঝিতে পারা না যায়, তাহাও সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। কুরআন-হাদীসের সমস্ত কথাই অভ্রান্ত সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে এবং সর্বদা এইরূপ চেষ্টা করিতে হইবে যেন

আল্লাহ্‌র মহব্বত হৃদয়ে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া প্রবল হইয়া উঠে ও দুনিয়ার মহব্বত ক্রমশ দুর্বল হইয়া যায়।

শরীয়তের নির্ধারিত সীমা রক্ষা করিয়া চলিলেই দুনিয়ার মহব্বত দুর্বল হইয়া যায়। কারণ, মানবের নিকট দুনিয়া সংকীর্ণ হইয়া পড়ে এবং হৃদয়ে তৎপ্রতি ঘৃণার উদ্রেক হয়। সর্বদা আল্লাহ্‌র যিকির করিলে এবং সংসারাসক্ত লোকদের প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া আল্লাহ্-প্রেমিকদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিলে মানবহৃদয়ে আল্লাহ্‌র মহব্বত বলবান হইয়া ওঠে। দুনিয়ার মহব্বত প্রবল থাকিলে মৃত্যুকালে ঈমান হারাইবার আশঙ্কা থাকে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন শরীফে বলেন–"তোমাদের পিতৃগণ, তোমাদের পুত্রগণ, তোমাদের ভ্রাতৃগণ, তোমাদের স্ত্রী সকল, তোমাদের আত্মীয়গণ ধন-সম্পদ যাহা তোমরা অর্জন করিয়াছ, বাণিজ্য যাহার বন্ধ হওয়াকে ভয় করিতেছ এবং যে গৃহসমূহ পছন্দ করিতেছ, এই সমুদয় যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা অপেক্ষা প্রিয়তর হয়, তবে আল্লাহ্‌র আদেশ না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর।" (সূরা তওবা, ৩ রুকূ, ১০ পারা।)

ধর্মপথে বিভিন্ন মকামের ক্রমবিকাশের ধারা–ধর্মপথে বহু মকাম আছে, তন্মধ্যে প্রথমটি ইয়াকীন (ধ্রুব বিশ্বাস) ও মারিফাত (খোদা-পরিচিতি)। মারিফাত হইতে ভয় এবং ভয় হইতে সংসার-বিরাগ, সবর ও তওবার উদ্ভব হয়। সংসার-বিরাগ ও তওবা হইতে সিদ্‌ক ইখ্‌লাস এবং সর্বদা আল্লাহ্‌র যিকির ও ধ্যান করিবার বাসনা জন্মে। এই শেষোক্তটি হইতে আবার প্রেম-ভালবাসার উদ্রেক হয়। মহব্বতের মকামই সর্বোচ্চ মকাম। তাস্‌লীম (পূর্ণ আনুগত্য), রিযা (সন্তুষ্টি) এবং শওক (অনুরাগ) মকামগুলি মহব্বতের অধীন। সুতরাং ইয়াকীন ও মারিফাতের পরে ভয় সৌভাগ্যের পরশমণি। ভয়ের পরবর্তী মকামসমূহে ভয়শূন্য ব্যক্তি উপনীত হইতে পারে না।

হৃদয়ে ভয় জাগ্রত করিবার উপায়–তিনটি উপায়ে হৃদয়ে ভয় জন্মে।

প্রথম উপায়– মানুষ নিজের ও আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয় পাইলে অবশ্যই তাহার মনে ভয়ের উদ্রেক হয়। কারণ, যে ব্যক্তি সিংহের কবলে পতিত হইয়াছে এবং সে সিংহ সম্বন্ধে ভালরূপে অবগত আছে, তাহার হৃদয়ে সিংহের ভয় জাগাইয়া তোলার জন্য এবং অন্য কোন উপায় অবলম্বনের আবশ্যকতা নাই। বরং স্বভাবতই তাহার সর্বশরীর সিংহ-ভয়ে প্রকম্পিত হইয়া উঠে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলাকে অপ্রতিহত প্রতাপশালী, অসীম ক্ষমতাবান ও সম্পূর্ণ

বেপরওয়া বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছে এবং তৎসঙ্গে স্বীয় অসহায়তা, দুর্বলতা ভালরূপে অবগত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি উক্ত সিংহের কবলে পতিত ব্যক্তির ন্যায় ভয়ে প্রকম্পিত না হইয়া পারে না। এইজন্য রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, একবার হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম হযরত আদম আলায়হিস্ সালামের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্তাপন করিলেন এবং হযরত আদম আলায়হিস্ সালামও ইহার জওয়াবে প্রমাণ পেশ করিলেন। হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম বলিলেন–"হে আদম, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে বেহেশ্‌তে স্থান দিয়াছিলেন এবং অমুক অমুক নি'আমত দান করিয়াছিলেন। এতদ্‌সত্ত্বেও কেন আপনি পাপ করিয়া নিজকে ও আমাদিগকে বিপদে নিপতিত করিলেন?" হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম জওয়াব দিলেন–"হে মূসা, আদিকালে এই পাপ আমার অদৃষ্টে লিপিবদ্ধ ছিল কিনা?" "হযরত মূসা (আ) বলিলেন–"হাঁ, লিপিবদ্ধ ছিল।" হযরত আদম (আ) বলিলেন –"তৎপর সেই আদেশের বিরুদ্ধাচারণ করিবার ক্ষমতা কি আমার ছিল?" হযরত মুসা (আ) বলিলেন–"না।" এইরপে হযরত আদম (আ) হযরত মূসা (আ) অভিযোগ খণ্ডিত করিলেন এবং হযরত মূসা (আ) নিরুত্তর হইয়া গেলেন।

যে মা'রিফাত হইতে ভয় জন্মে, ইহার বহু ধাপ আছে। যে ব্যক্তি যতটুকু মা'রিফাত হাসিল করিয়াছে, সেই ব্যক্তি ততটুকুই আল্লাহ্‌কে ভয় করিয়া থাকে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, একবার রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এবং হযরত জিবরাঈল আলায়হিস্ সালাম উভয়েই রোদন করিতেছিলেন। এমন সময় ওহী অবতীর্ণ হইল– "আমি তোমাদিগকে অভয় দান করিয়াছি, তথাপি তোমরা রোদন করিতেছ কেন?" তাঁহারা নিবেদন করিলেন– "ইয়া আল্লাহ্ তোমার বাহানা হইতে আমরা নির্ভর নহি।" উত্তর আসিল–"তদ্রূপই মনে করিতে থাক।" মারিফাতের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে, আল্লাহ্‌কে ভয় না করিয়া থাকা উচিত নহে। নির্ভয়ে থাকিবার জন্য তাঁহাদের প্রতি যে প্রত্যাদেশ হইয়াছিল, তাহা হয়ত কোন পরীক্ষা ছিল বা ইহাতে কোন রহস্য নিহিত ছিল, যাহা আমরা অবগত নহি।

বদর-যুদ্ধে প্রথমে মুসলমান সৈন্যদল দুর্বল হইয়া পড়িল। ইহাতে রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ভীত হইয়া বলিলেন–"ইহা আল্লাহ্, মুসলমানের এই দল বিনষ্ট হইলে ভূপৃষ্ঠ তোমার ইবাদত করিবার আর কেহই থাকিবে না।" ইহা শুনিয়া হযরত আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলিলেন– "হে

আল্লাহ্‌র রাসূল, আপনি কি আল্লাহ্‌কে শপথ দিতেছেন? তিনি ত আপনাকে বিজয় দানের প্রতিশ্রুতি পূর্বেই দিয়াছেন এবং এই প্রতিশ্রুতি তিনি নিশ্চয়ই পূর্ণ করিবেন।" সেই সময় হযরত আবূ বকর (রা) ইয়াকীনের মকামে উপনীত ছিলেন, কারণ তিনি ছিলেন সিদ্দীক। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বস হইয়াছিল যে, আল্লাহ্ অবশ্যই বিজয় দানের অঙ্গীকার পূর্ণ করিয়া দেখাইবেন। অপরপক্ষে রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের এই অবস্থা ছিল যে, তিনি মহাকৌশলী আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত ছিলেন। কারণ, তিনি ছিলেন রাসূল। আর রিসালতের মকাম সিদ্দীকের মকাম হইতে উন্নতর। এইজন্য রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম অবগত ছিলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার কার্যাবলী ও সমস্ত বিশ্বজগত পরিচালনায় তাঁহার যে মঙ্গলময় বিধান অহরহ কাজ করিয়া যাইতেছে, ইহার গুপ্ত রহস্য এবং তাঁহার নির্ধারিত বিষয়সমূহ কেহই অবগত নহে।

দ্বিতীয় উপায়–খোদা-পরিচিতি লাভে অক্ষম হইলে আল্লাহ্-ভীরু লোকদের সংসর্গ অবলম্বন করা আবশ্যক। তাহা হইলে আল্লাহ্-ভীরু লোকদের ভয় তাহাদের অন্তরে অনুপ্রবেশ করিবে। গাফিল অসতর্ক লোকদের হইতে দূরে সরিয়া থাকা উচিত। অন্ধ অনুকরণ হইলেও এই পন্থা অবলম্বন করিয়া চলিলে মানবহৃদয়ে ভয়ের উদ্রেক হইয়া থাকে। ইহার উদাহরণ এইরূপ, যেমন বালক পিতাকে সর্প দর্শনে পলায়ন করিতে দেখিয়া পিতার দেখাদেখি সে-ও সর্প ভয়ে পলায়ন করে, অথচ সর্প যে অনিষ্টকর জন্তু ইহা বালক অবগত নহে। কিন্তু যাহারা সর্পের অনিষ্টকারিতার পরিচয় পাইয়া ভয় করিতে শিখিয়াছে, তাহাদের ভয় অপেক্ষা শিশুদের এইরূপ দেখাদেখি ভয় নিতান্ত দুর্বল। কারণ, তাহারা পিতামাতাকে সর্প হইতে পলায়ন করিতে দেখিয়া যেরূপ ভয় করিতে শিখিয়াছে, আবার কোন সাপুড়িয়াকে কয়েকবার সর্প ধরিতে ও সর্পের গাত্রে হস্ত রাখিতে দেখিলে তদ্রূপ সেই ভয় লোপ পাইবে এবং তাহারাও সর্পের গাত্রে হাত দিবে। যে ব্যক্তি সর্পের অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে অবগত আছে, সে কখনও সাপুড়িয়ার দেখাদেখি সর্পের গাত্রে হাত দিবে না। সুতরাং পরকাল সম্বন্ধে চিন্তাশূন্য ও মোহমুগ্ধ অজ্ঞান লোকের সংসর্গ পরিত্যাগ করা প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্তব্য। বিশেষত যে সকল মোহমুগ্ধ অজ্ঞান লোক আলিমের বেশে বিচরণ করেন, তাহাদের সংসর্গ সযত্নে বর্জন করা উচিত।

তৃতীয় উপায়–বর্তমান সময়ে আল্লাহ্-ভীরু লোক নিতান্ত বিরল। তাই এরূপ লোকের সংসর্গ পাওয়া না গেলে তাঁহাদের উপাখ্যান শ্রবণ করা ও

তাঁহাদের কিতাব পাঠ করা আবশ্যক। তাহা হইলেও হৃদয়ে পরকালের ভয় জাগ্রত হইবে। এই উদ্দেশ্যেই কয়েকজন পয়গম্বর ও ওলী-আল্লাহ্‌র ভয়ের কাহিনী এ-স্থলে বর্ণিত হইতেছে। যাহাদের বিন্দুমাত্রও বুদ্ধি আছে, তাহারা বুঝিতে পারিবে যে, এই মহামনীষিগণ জগতে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান, আরিফ (চক্ষুষ্মান) ও পরহেযগার ছিলেন। তাঁহারাই যখন তদ্রূপ ভয়ে সন্ত্রস্ত ছিলেন তখন সাধারণ লোকের পক্ষে কত অধিক ভয় করিয়া চলা আবশ্যক।

ফিরিশ্‌তা ও পয়গম্বরগণের ভয়ের কাহিনী– বর্ণিত আছে যে, ইবলীস অভিশপ্ত হওয়ার পর হযরত জিবরাঈল আলায়হিস সালাম এবং হযরত মীকাঈল আলায়হিস সালাম সর্বদা রোদন করিতেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাদের উপর ওহী অবতীর্ণ করিলেন–"তোমরা রোদন কর কেন?" তাঁহারা নিবেদন করিলেন–"আমরা আপনার অভিসন্ধি হইতে নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না।" উত্তর আসিল–"হাঁ, ইহাই উচিত, নিশ্চিন্ত থাকিও না।" হযরত মুহাম্মদ ইব্‌নে মুন্‌কাদির (র) বলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা দোযখ সৃজন করিলে সমস্ত ফিরিশ্‌তা রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎপর আল্লাহ্ মানুষ সৃষ্টি করিলে তাঁহারা ক্রন্দন ক্ষান্ত করিলেন। কারণ, তাঁহারা জানিতে পারিলেন যে, দোযখ তাঁহাদের জন্য সৃষ্টি হয় নাই। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "জিবরাঈল যখনই আমার নিকট আসিতেন তখনই তাঁহাকে আল্লাহ্‌র ভয়ে কম্পিত ও ভীত সন্ত্রস্ত দেখা যাইত।" হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহ আন্‌হু হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হযরত জিবরাঈল আলায়হিস সালামকে জিজ্ঞাসা করিলেন– "আমি মীকাঈলকে কখনো হাসিতে দেখি নাই, (ইহা কারণ কি?)" হযরত জিবরাঈল (আ) উত্তর দিলেন–"যে সময় হইতে আল্লাহ্ দোযখের অগ্নি সৃষ্টি করিলেন, সেই সময় হইতে তিনি হাসেন না।"

নামায পড়িবার সময় হযরত ইব্‌রাহীম আলায়হিস্ সালামের হৃদয়ে এমন ভয়ের উচ্ছ্বাস উথলিয়া উঠিত যে, এক মাইল দূর হইতে লোকে সেই শব্দ শুনিতে পাইত। হযরত মুজাহিদ (র) বলেন–"হযরত দাঊদ আলায়হিস্ সালাম চল্লিশ দিন পর্যন্ত সিজদায় প্রণত হইয়া রোদন করিতেছিলেন, এমনকি তাঁহার অশ্রু দ্বারা ঘাস অঙ্কুরিত হইয়াছে। তৎপর আকাশবাণী শুনা গেল–'হে দাঊদ, কেন কাঁদিতেছ? যদি ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত বা অনাবৃত থাক তবে বল, আহার, পানি ও বস্ত্র প্রেরণ করি।' ইহা শুনিয়া তিনি এমন জ্বলন্ত দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন যে, ইহার উত্তাপে কাষ্ঠে অগ্নি ধরিয়া গেল। যাহা হউক, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার

তওবা কবূল করিলেন। তৎপর তিনি নিবেদন করিলেন–'ইয়া আল্লাহ্, আমার পাপ আমার হাতের তালুতে অঙ্কিত করিয়া দাও যেন আমি ইহা ভুলিতে না পারি।' আল্লাহ্ তাঁহার প্রার্থনা কবূল করিলেন। ইহার পর যখনই তিনি পানাহারের দিকে হস্ত প্রসারিত করিতেন তখনই স্বীয় তালুতে অঙ্কিত পাপ দেখিয়া লইতেন এবং রোদন করিতে থাকিতেন। কোন কোন সময় তিনি এত অধিক রোদন করিতেন যে, অপূর্ণ পানপাত্র তাঁহাকে দিলে ইহা তাঁহার অশ্রুতে ভরিয়া যাইত।"

বর্ণিত আছে যে, রোদন করিতে করিতে হযরত দাঊদ আলায়হিস্ সালামের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হইয়া গেল। সেই সময় তিনি নিবেদন করিলেন–"ইয়া আল্লাহ্, আমার রোদনে তোমার দয়া হয় না?" ওহী আসিল–"হে দাঊদ, রোদনের কথা ত বলিতেছ, কিন্তু পাপের কথা ভুলিয়া গেলে?" তিনি নিবেদন করিলেন–"ইয়া আল্লাহ্, পাপ কিরূপে ভুলিতে পারি? পাপ করিবার পূর্বে আমি যখন যবুর পড়িতাম তখন ইহা শুনিতে পানির স্রোত ও বায়ু-প্রবাহ বন্ধ হইত, পক্ষী আমার মাথার উপর সমবেত হইত এবং মানুষ দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করে এবং বন্য পশু আমার মিহ্‌রাবে আসিয়া জমা হইত। এখন সেই সমস্ত কিছুই হয় না। ইয়া আল্লাহ্, এখন ইহারা আমাকে ভয় ও ঘৃণা করে কেন?" আল্লাহ্ বলিলেন–"ইবাদতের প্রতি ভালবাসার জন্য পূর্বে ঐরূপ ঘটিত এবং এখন পাপের ভয়ে এইরূপ হইতেছে। হে দাউদ, আদম (আ) আমার বান্দা। আমি তাহাকে স্বীয় করুণার হস্তে সৃজন করিয়াছিলাম, আমার রূহ তাহার মধ্যে ফুৎকার করিয়া দিয়াছিলাম, তাহাকে সিজদা করিতে ফিরিশ্‌তাদিগকে আদেশ করিয়াছিলাম, সম্মানের পরিচ্ছদ তাহার পরিধানে দিয়াছিলাম, সম্ভ্রমের মুকুট তাহার মস্তকে স্থাপন করিয়াছিলাম এবং সে স্বীয় নির্জনতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলে হাওয়াকে সৃজন করিয়া উভয়কে একত্রে বেহেশ্‌তে থাকিবার অনুমতি প্রদান করিলাম। তৎপর সে একটি পাপ করিলে বিবস্ত্র ও অপমান করত আমি তাহাকে আমার দরবার হইতে বাহির করিয়া দিলাম। হে দাঊদ, শুন এবং বিশ্বাস কর যে, তুমি যখন আমার ইবাদত করিতে তখন আমি তোমার কথা শুনিতাম এবং যাহা প্রার্থনা করিতে, তাহা তোমাকে দান করিতাম। তুমি পাপ করিলে, আমিও (তওবা করিবার জন্য) তোমাকে অবকাশ দিলাম। এতদ্‌সত্ত্বেও তুমি তওবা করত আমার দিকে প্রত্যাবর্তন করিলে আমি কবূল করিব।"

হযরত ইয়াহ্ইয়া ইব্নে কাসীর (র) বলেন যে, হযরত দাউদ আলায়হিস্ সালাম স্বীয় পাপের জন্য অনুতপ্ত হইয়া রোদন করিতে চাহিলে সাত দিন পর্যন্ত কিছুই আহার করিতেন না, স্ত্রীপরিজনের মুখ দেখিতেন না। তৎপর বিজন প্রান্তরে গমন করত তদীয় পুত্র হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালামকে তাঁহার অনুতাপ-গাথা শ্রবণের জন্য সাধারণ্যে ঘোষণা করিতে আদেশ দিতেন। তদনুযায়ী হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম ঘোষণা করিতেন–"হে খোদার বান্দাগণ, দাউদের বিলাপ শুনিতে চাহিলে আস।" ইহা শুনিয়া দলে দলে নর-নারী জনপদ হইতে প্রান্তরে যাইত, বন্য পশু ও পক্ষী পাহাড় ও অরণ্য ছাড়িয়া চলিয়া আসিত। হযরত দাউদ আলায়হিস্ সালাম আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা দ্বারা তাঁহার বিলাপ আরম্ভ করিতেন। মানুষ ও সকল জীবজন্তু ইহা শুনিয়া 'হায়, আহা' বলিয়া আর্তনাদ করিতে থাকিত। ইহার পর বেহেশ্ত-দোযখের বর্ণনা করিয়া তিনি নিজের বিলাপ আরম্ভ করিতেন। ইহা শ্রবণ করিয়া বহু শ্রোতা দুঃখ ও ভয়ে অভিভূত হইয়া প্রাণত্যাগ করিত। তখন হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম তাঁহার নিকট আগমন করত নিবেদন করিতেন–"আব্বাজান, বহু লোক মারা পড়িয়াছে, এখন বিলাপ বন্ধ করুন।" আর তিনি ঘোষণা করিতেন–"সকলেই তোমাদের আপন আপন মৃতদেহ লইয়া যাও।" তদনুযায়ী সকলেই মৃতদেহ উঠাইয়া লইয়া যাইত। একদিন দেখা গেল যে, চল্লিশ হাজার শ্রোতার মধ্যে ত্রিশ হাজার প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

হযরত দাউদ আলায়হিস্ সালামের দুই পরিচারিকা ছিল। ভয়ের সময় কাঁপিতে কাঁপিতে শরীরের অঙ্গ-প্রতঙ্গ যেন উৎপাটিত হইয়া না যায় তজ্জন্য তাহারা তাঁহাকে ধরিয়া রাখিত।

হযরত যাকারিয়া আলায়হিস্ সালামের পুত্র হযরত ইয়াহ্ইয়া আলায়হিস্ সালাম শৈশবকালেই ইবাদত করিবার জন্য বায়তুল মুকাদ্দাসে গমন করিতেন। সমবয়স্ক বালকেরা তাঁহাকে খেলা করিতে আহবান করিলে তিনি বলিতেন–"আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে খেলার জন্য সৃজন করেন নাই।" পনর বৎসর বয়সে তিনি লোকালয় পরিত্যাগ করত অরণ্যবাস অবলম্বন করিলেন। একদা হযরত যাকারিয়া আলায়হিস্ সালাম তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, তিনি পানিতে দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছেন; অথচ পিপাসায় তাঁহার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে এবং তিনি নিবেদন করিতেছেন–"ইহা আল্লাহ্, তোমার গৌরবের শপথ, তোমার নিকট আমার পদমর্যাদা কি, ইহা

অবগত না হওয়া পর্যন্ত আমি পানি পান করিব না।" তিনি এত অধিক রোদন করিতেন যে, মুখমণ্ডলের উপর দিয়া অশ্রুধারা বহিয়া যাইতে যাইতে মুখমণ্ডলের মাংসপেশী গলিয়া পড়িয়াছিল; ইহাতে দন্তপংক্তি বাহির হইয়া গিয়াছিল এবং লোক যেন এই আকৃতি দেখিতে না পায় এইজন্য দুই টুকরা ছিন্ন বস্ত্র দ্বারা তিনি মুখমণ্ডল ঢাকিয়া রাখিতেন।

সাহাবা ও প্রাচীন বুযুর্গগণের ভয়ের কাহিনী–হযরত আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আন্হু কোন পক্ষী দর্শনেও বলিতেন–"হায়, আমি যদি তোমার ন্যায় (পক্ষী) হইতাম।" হযরত আবূ যর রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলিতেন–"হায়, আমি যদি বৃক্ষ হইতাম।" হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলিতেন–"হায়, আমার অস্তিত্বই যদি না হইত।" হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্হু কুরআন শরীফের কোন আয়াত শ্রবণ করিলে বেহুশ হইয়া পড়িতেন এবং কখন কখন অবস্থা এমন গুরুতর হইয়া উঠিত যে, কিছুদিন পর্যন্ত তাঁহাকে শয্যাগত থাকিতে হইত। তিনি অত্যধিক রোদন করিতেন। এই কারণে বদনমণ্ডলে দুইটি দাগ পড়িয়াছিল। তিনি বলিতেন–"হায়, ওমর যদি মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠই না হইত।" একদিন তিনি উষ্ট্রারোহণে কোন স্থানে গমন করিতেছিলেন। পথপ্রান্তে এক গৃহে কোন এক ব্যক্তি কুরআন শরীফ পাঠ করিতেছিল। তিনি সেই গৃহদ্বার অতিক্রম করিবার কালে পাঠক উচ্চারণ করে – إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ অর্থাৎ "অবশ্যই আপনার প্রভুর শাস্তি হইবেই হইবে।" (সূরা তূর, ১ রুকূ, ২৭ পারা।) এই আয়াত শুনিয়া তিনি উষ্ট্রপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন এবং পার্শ্বস্থ এক গৃহ প্রাচীরে হেলান দিয়া বসিয়া পড়িলেন। তিনি নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। লোকে ধরাধরি করিয়া তাহাকে গৃহে লইয়া গেল। এক মাস পর্যন্ত তিনি তদ্রূপ অবস্থায় রহিলেন; অথচ তাঁহার পীড়ার কারণ কেহই বুঝিতে পারে নাই।

হযরত হুসায়ন রাযিয়াল্লাহু আন্হুর পিতা হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্হুর বদনমণ্ডল ওযু করিবার সময় পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিত। লোকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন–"তোমরা কি জান না, আমি কাহার সম্মুখে দাঁড়াইতে যাইতেছি?" হযরত মুসাওয়ার ইব্নে মখর্মা (র) এত ভয়াতুর হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, কুরআন শরীফ শ্রবণ করিবার সামর্থ্য তাঁহার ছিল না। একদা এক অপরিচিত ব্যক্তি অজ্ঞাতসারে তাঁহার সম্মুখে এই আয়ত পাঠ করিল–

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا ـ وَنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا ـ

অর্থাৎ "যে-দিন পরহেযগারদিগকে পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র সমীপে মেহমানদের ন্যায় সাদরে একত্রিত করা হইবে এবং পাপীদিগকে পিপাসার্ত অবস্থায় দোযখের দিকে লইয়া যাওয়া হইবে। (সূরা মারইয়াম, ৬ রুকূ, ১৬ পারা।) ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন–"আমি কি পাপীদের দলভুক্ত, না পরহেযগারদের অন্তর্গত?" তিনি পাঠককে আবার ঐ আয়াত পড়িতে বলিলেন। সেই ব্যক্তি পুনরায় পাঠ করিল। এইবার শুনামাত্র এক বিকট চিৎকার করত তিনি ভূতলে পড়িয়া গেলেন এবং তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন।

হযরত হাতেম আসেম (র) বলেন–"উত্তম স্থান পাইয়া গর্ব করিও না। বেহেশ্‌ত অপেক্ষা মনোরম স্থান আর নাই। হযরত আদম আলায়হিস সালামকে তথায় বাস করিতে দেওয়া হইয়াছিল। ভাবিয়া দেখ, তৎপর তাঁহার কি দশা ঘটিল। অধিক ইবাদত করিয়াছ বলিয়াও অহংকার করিও না। কারণ, শয়তানও কয়েক সহস্র বৎসর ইবাদত করিয়াছিল। অধিক ইলম শিক্ষা করিয়াছ বলিয়াও গর্বে স্ফীত হইও না। কেননা, 'বল্‌আম, বাউ'র এত বিদ্যা শিখিয়াছিল যে, ইসমে আযম পর্যন্ত জানিতে পারিয়াছিল। অথচ তাহার নিন্দা করিয়া এই আয়াত অবতীর্ণ হয়–

فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ـ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ـ

অর্থাৎ 'তাহার দৃষ্টান্ত কুকুরের ন্যায়। কুকুরের উপর বোঝা চাপাইলে হাঁপাইতে থাকে; আর না চাপাইলেও হাঁপাইতে থাকে।' (সূরা আরাফ, ২২ রুকূ, ৯ পারা।) বুযুর্গ লোকের দর্শন লাভ করিয়াও গর্বিত হইও না। কারণ, রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আত্মীয়-স্বজন তাঁহার সংসর্গ ও দর্শন লাভ করিয়াও ঈমানদার হইতে পারে নাই।"

হযরত আতা সাল্‌মীও আল্লাহ্‌-ভীরু লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। একাদিক্রমে চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত তিনি হাসেন নাই এবং আকাশের দিকেও দৃষ্টিপাত করেন নাই। একবার আকাশের দিকে দৃষ্টি পড়া মাত্র তিনি বেহুশ হইয়া পড়িয়া গেলেন। দিবারাত্রের মধ্যে কয়েকবার তিনি নিজের শরীরে হাত

বুলাইয়া দেখিতেন যে, তাঁহার আকৃতি পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে কিনা। আল্লাহ্‌র সৃষ্টির উপর কোন বিপদ বা দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি আসিলে তিনি বলিতেন–"আমার পাপের কারণেই এই সমস্ত বিপদাপদ অবতীর্ণ হইয়াছে। আমি মরিয়া গেলে লোকে এই সকল বিপদ হইতে অব্যাহতি পাইবে।" হযরত সররী সক্‌তী (র) বলেন–"প্রত্যহ আমার নাকের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মনে মনে বলি– হয়ত আমার বদনমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছেন।"

হযরত ইমাম হাম্বল (র) বলেন–"ভয়ের একটি দরজা উন্মুক্ত পাইতে আমি আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করিলাম। আমার প্রার্থনা কবূল হইল। তৎপর ভয়ে আমার বুদ্ধি লোপ পাইবার উপক্রম হইল। ইহা বুঝিতে পারিয়া আবার প্রার্থনা করিলাম। –'ইয়া আল্লাহ্‌, আমি যতটুকু ভয় সহ্য করিতে পারি ততটুকু ভয় আমাকে দান কর।' তখন আমার মন স্থির হইয়া গেল।" একজন আবিদ রোদন করিতেন দেখিয়া লোকে রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তিনি উত্তরে বলিলেন–"কিয়ামত-দিবস যে সময়ে ঘোষণা করা হইবে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহাদের নিজ নিজ কার্যের প্রতিদান দেওয়া হইবে, সেই সময়ের ভয়ে আমি রোদন করিতেছি।" এক ব্যক্তি হযরত হাসান বসরী (র)-কে জিজ্ঞাসা করিল–"আপনি কেমন আছেন?" তিনি বলিলেন–"সমুদ্রে নৌকা ভাঙ্গিয়া গেলে আরোহীদের প্রত্যেকেই যদি এক একটি তক্তা অবলম্বনে ভাসিতে থাকে তবে অবস্থা কিরূপ হয়?" সেই ব্যক্তি উত্তর দিল–"নিতান্ত কঠিন।" তিনি বলিলেন–"আমার অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ।" তিনি অন্যত্র বলেন–"হাদীস শরীফে উক্ত আছে যে, এক ব্যক্তিকে সহস্র বৎসর পরে দোযখ হইতে বাহির করা হইবে।" এই কথা বলিয়া তিনি আবার বলিলেন–"হায়, এই ব্যক্তি হয়ত আমিই হইব।" ঈমানের সহিত মৃত্যু হইবে কিনা এবং ঈমানের সহিত মৃত্যু না হইলে চিরকাল দোযখে থাকিতে হইবে, এই ভয়ে তিনি সর্বদা ভীত থাকিতেন বলিয়াই ঐ প্রকার উক্তি করিয়াছিলেন।

হযরত ওমর ইব্‌নে আবদুল আযীয (র)-এর এক পরিচারিকা একদা নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া বলিতে লাগিল–"হে আমীরুল মুমিনীন, আমি এক বিস্ময়কর স্বপ্ন দেখিয়াছি।" তিনি অতিশীঘ্র স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে আদেশ করিলেন। সে নিবেদন করিল–"আমি দেখিলাম, দোযখের অগ্নি প্রজ্বলিত করত তদুপরি 'পুলসিরাত' স্থাপন করা হইয়াছে এবং ফিরিশ্‌তাগণ খলীফাদিগকে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। সর্বপ্রথমে খলীফা আবদুল মালিক ইব্‌নে মারওয়ানকে আনিয়া পুলসিরাত

পার হইয়া যাইতে আদেশ দেওয়া হইল। তিনি কিছু দূর যাইতে না যাইতেই ধপ্ করিয়া দোযখে পড়িয়া গেলেন। তিনি বলিলেন–"তাড়াতাড়ি বল, তৎপর কি হইল?" পরিচারিকা বলিতে লাগিল–"ইহার পর আবদুল মালিকের পুত্র ওলীদকে আনা হইল। তিনিও পিতার ন্যায় দোযখে পড়িয়া গেলেন।" তিনি বলিলেন–"তারপর কি দেখিলে, শীঘ্র বল।" পরিচারিকা বলিতে লাগিল–"তারপর আবদুল মালিকের পুত্র সুলায়মানকে আনয়ন করা হইল। তিনিও পূর্ববর্তীদের ন্যায় দোযখে পড়িলেন।" ইহার পর কি হইল বর্ণনা করিবার জন্য পরিচারিকাকে আদেশ করিলেন। সে বলিতে লাগিল–"হে আমীরুল মুমিনীন, তৎপর আপনাকে আনা হইল।" এতটুকু বলা মাত্রই হযরত ওমর ইব্নে আবদুল আযীয (র) বিকট চিৎকার করত অচেতন হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। পরিচারিকা আল্লাহ্র শপথ করিয়া উচ্চৈস্বরে বলিতে লাগিল–"আপনাকে নিরাপদে পুলসিরাত পার হইয়া যাইতে দেখিয়াছি।" পরিচারিকা বৃথাই চিৎকার করিতেছিল; কোন মতেই তাঁহার সংজ্ঞা হইল না। তিনি পূর্বের ন্যায় লুণ্ঠিত হইতে এবং হাত পা আছড়াইতে লাগিলেন।

হযরত হাসান বসরী (র) কয়েক বৎসর পর্যন্ত হাসেন নাই। তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত যেন তাঁহাকে বন্দী করিয়া শিরচ্ছেদের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। লোকে জিজ্ঞাসা করিল–"আপনি এত কঠোর রিয়াযত (সাধনা) ও ইবাদত করা সত্ত্বেও রোদন করেন কেন?" তিনি বলিলেন–"আমার ভয় হয় যে, হয়ত আমার দ্বারা এমন কোন কার্য সম্পন্ন হইয়াছে যাহার কারণে আল্লাহ আমাকে শত্রু জ্ঞান করিয়া লইয়াছেন এবং তিনি বলিতেছেন "তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর; কিন্তু আমি কখনও তোমার প্রতি দয়া প্রর্দশন করিব না।"

যাহা হউক, এবংবিধ বহু উপাখ্যান আছে। এখন ভাবিয়া দেখ, এই সকল মহামনীষী ভয়ে কত ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলেন, আর তুমি একেবারে নির্ভয় হইয়া রহিলে। তাঁহাদের ভয় এবং তোমার ভয়শূন্যতার কারণ হয়ত এই যে, তাঁহারা ছিলেন অধিক পাপী এবং তুমি একবারে নিষ্পাপ; অথবা তাঁহাদের মারিফাত ছিল–তাঁহারা সব বুঝিতেন: অপর পক্ষে তুমি মারিফাত হইতে বঞ্চিত–কিছুই বুঝিতে পারিতেছ না। সত্য কথা ত এই যে, তুমি অধিক পাপী হওয়া সত্ত্বেও স্বীয় অসতর্কতা ও মূর্খতার দরুন তুমি নির্ভয় এবং ঐ সকল মহামনীষী এত অধিক ইবাদত, রিয়াযত-মুজাহাদা করা সত্ত্বেও সূক্ষ্ম পরিচয়-জ্ঞান লাভ করিয়াছেন বলিয়া ঐরূপ ভীত-সন্ত্রস্ত থাকিতেন।

অবস্থাভেদে ভয় ও আশার প্রয়োগ ব্যবস্থা–এ-স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, বহু হাদীসে ভয় ও আশা, এই দুইটির ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে; এমতাবস্থায় এতদুভয়ের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ? যাহা শ্রেষ্ঠ তাহাই অবলম্বন করা উচিত। ভয় ও আশা দুইটিই মানসিক রোগের ঔষধ; অবস্থাভেদে উভয়টিই উপকারী। সুতরাং ঔষধের শ্রেষ্ঠত্ব নাই, বরং উপকারিতা আছে। কারণ, ভয় ও আশা মানুষের পূর্ণ গুণ নহে। মানুষ যদি আল্লাহর ভালবাসায় সম্পূর্ণ ডুবিয়া থাকে এবং আল্লাহ্র ধ্যান তাহাকে একেবারে বেষ্টন করিয়া লয়, আর সে যদি আদি-অন্ত সমস্ত ভুলিয়া গিয়া কেবল বর্তমানে কি হইতেছে তাহাই লক্ষ্য করে, এমন কি সময়টি পর্যন্ত ভুলিয়া সময়ের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্কে লইয়া একান্তভাবে ব্যাপৃত থাকে, তবেই সে চরম উৎকর্ষ লাভ করে এবং ইহাই তাহার পূর্ণ গুণ। ভয় ও আশার দিকে মনোনিবেশ করিলে ইহাই আল্লাহ্-প্রাপ্তির অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু আল্লাহ্-প্রেমে বিভোর তদ্রূপ ব্যক্তি নিতান্ত বিরল। এইজন্য যাহার মৃত্যু নিকটবর্তী হইয়াছে, তাহার মনে আল্লাহত্ম রহ্মতের আশা প্রবল রাখা আবশ্যক। কারণ, আশা ভালবাসা বৃদ্ধি করে। ইহজগত পরিত্যাগ করত পরপারে যাইবার সময় আল্লাহ্র মহব্বতে পরিপূর্ণ অন্তর লইয়া যাওয়া উচিত। তাহা হইলেই আল্লাহ্র সহিত মিলন সুখের হইবে; কেননা প্রেমাস্পদের মিলনেই পরম আনন্দ পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে মৃত্যুর নিকটবর্তী সময় ভিন্ন অন্য সময়ে মানুষ যদি ধর্মকর্মে উদাসীন ও শিথিল থাকে তবে ভয়কে তাহারা মনে প্রবল করিয়া দেওয়া আবশ্যক। কারণ, এমন ব্যক্তির জন্য আশা মারাত্মক বিষতুল্য। আবার পরহেযগার নীতিবান ব্যক্তির মনে ভয় ও আশা সমান থাকা উচিত। মানুষ ইবাদত ও সৎকার্যে প্রবৃত্ত থাকিলে রহমতের আশা রাখা উচিত। কেননা প্রার্থনার সময় ভালবাসায় মন নির্মল হয় এবং আশা হইতেই ভালবাসার উৎপত্তি হয়। অপরপক্ষে পাপের সময় হৃদয়ে ভয় প্রবল করা কর্তব্য। যাহারা অভ্যাসের দাস, মুবাহ কার্যের সময়েও তাহাদের মনে ভয় প্রবল করিয়া রাখা আবশ্যক। অন্যথায় তাহারা পাপে নিপতিত হইয়া পড়িবে।

অতএব এ-পর্যন্ত যাহা বর্ণিত হইল, ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ভয় ও আশা এমন দুইটি ঔষধ যাহার উপকারিতা এবং ক্রিয়া মানব-হৃদয়ের অবস্থার তারতম্যানুসারে পরিবর্তিত হয়। এইজন্যই ভয় ও আশার মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ, এ-প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেওয়া চলে না।

চতুর্থ অধ্যায়

অভাবগ্রস্ততা ও সংসার-বিরাগ (যুহ্‌দ)

চারটি মূল পদার্থের উপর ধর্মপথের ভিত্তি স্থাপিত আছে। দর্শন খণ্ডে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। চারটি মূল পদার্থ এই ঃ (১) মানবাত্মা, (২) আল্লাহ্, (৩) ইহকাল ও (৪) পরকাল। তন্মধ্যে দুইটি গ্রহণযোগ্য এবং অপর দুইটি বর্জনোপযোগী। আল্লাহ্‌কে পাইবার জন্য নিজেকে ভুলিয়া যাইতে হইবে এবং পরকাল পাইবার আশায় ইহকালকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। সুতরাং আমিত্ব হইতে মুখ ফিরাইয়া আল্লাহ্‌র দিকে দৃষ্টি নিবিষ্ট করা আবশ্যক এবং দুনিয়াকে পদাঘাতে দূরে ফেলিয়া আখিরাতের দিকে দৌড়িয়া চলা কর্তব্য। ভয়, সবর এবং তওবা ইহার সূচনা; কিন্তু দুনিয়ার মহব্বত ইহা ধ্বংস করিয়া ফেলে। দুনিয়ার মহব্বত দূরীকরণের উপায় ইতঃপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। সংসারের প্রতি অনাসক্তি ও ইহার সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করা পরিত্রাণের উপায়। এ-স্থলে ইহার ব্যাখ্যা করা হইবে। ইহার সারমর্মই হইল দরিদ্র্যতা ও সংসার-বিরাগ। প্রথমে এই দুইটির হাকীকত ও ফযীলত বর্ণিত হইবে।

অভাবগ্রস্ততা ও সংসার-বিরাগের হাকীকত–যাহার অভাব মোচনের পরিমিত বস্তু নাই এবং ইহা উপার্জন করিবার শক্তিও নাই, তাহাকে অভাবগ্রস্ত বলে। মানুষের প্রথম অভাব অস্তিত্বের এবং তৎপর হইল তাহার জীবিত থাকিবার আবশ্যকতা। জীবনের সঙ্গে আহার ও ধনের অভাব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আরও বহু দ্রব্যের অভাব ও আবশ্যকতা আসিয়া জুটিয়াছে। যে-সকল পদার্থে মানুষের অভাব মোচন হইতেছে, ইহার কোনটাই তাহার ক্ষমতা ও আয়ত্তে নহে; অথচ উহা না হইলে মানুষ জীবনধারণ করিতে পারে না। অপরপক্ষে যাহার কিছুমাত্র অভাব নাই, যিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন, তাঁহাকে ধনী বলে। আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত এরূপ ধনী অপর কেহই হইতে পারে না। মানব, জিন, ফিরিশতা, শয়তান ইত্যাদি যাহা কিছু বর্তমান আছে, তৎসমুদয়ের অস্তিত্ব এবং জীবন তাহাদের দ্বারা হয় নাই। সুতরাং বাস্তবপক্ষে তাহাদের সকলেই ফকীর। এইজন্য আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ –

অর্থাৎ "একমাত্র আল্লাহ্‌ই ধনী এবং তোমরা সকলেই ফকীর।" (সূরা মুহাম্মদ, ৩৪ রুকূ, ২৬ পারা।) হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম ফকীরের ব্যাখ্যা করিয়া বলেন–

اَصْبَحْتُ مُرْتَهِنًا بِعَمَلِيْ وَالْاَمْرُ بِيَدِ غَيْرِيْ فَلَا فَقِيْرَ اَفْقَرُ مِنِّي

অর্থাৎ "আমি আমার কাজে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি; অথচ ইহার কুঞ্জি অন্যের হাতে। এমতাবস্থায় আমা অপেক্ষা ফকীর আর কে হইতে পারে?" আল্লাহ্ তা'আলাও এই অর্থেই বলেন ঃ

وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ـ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَاءُ –

অর্থাৎ "আপনার প্রভু আল্লাহ্ তা'আলা ধনী ও করুণাময়। তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে দূর করিবেন এবং যাহাকে ইচ্ছা তোমাদের পরে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করিবেন।" (সূরা আন'আম, ১৬ রুকূ, ৮ পারা।) ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, সৃষ্টিমাত্রই দরিদ্র।

সূফীগণের ভাষায় ফকীরের অর্থ– উপরে যেরূপ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, যে-ব্যক্তি নিজেকে তদ্রূপ অক্ষম ও দরিদ্র জ্ঞান করে ও ইহা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিয়া লয় এবং ইহাও বুঝে যে, ইহকাল ও পরকালে কোন বস্তুর উপরই তাহার কোন ক্ষমতা নাই—সৃষ্টির প্রারম্ভে যেমন কোন ক্ষমতা ছিল না, বর্তমানেও নাই এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে না, সেই ব্যক্তিকে সূফীগণের পরিভাষায় ফকীর বলে।

শয়তানের প্রবঞ্চনা ও ইহার প্রতিকার –সূফীগণের বর্ণিত অভাবগ্রস্ততার অর্থ শ্রবণ করত নির্বোধগণ বলে, ইবাদত একেবারে ছাড়িয়া না দেওয়া পর্যন্ত ফকীর হওয়া যায় না। কারণ, ইবাদত করিলে পুণ্য হয় এবং ইহা ইবাদতকারীর জন্য সঞ্চিত থাকে। সুতরাং তাহাকে ফকীর বলা যাইতে পারে না। এইরূপ উক্তি বেঈমানি ও কুফ্‌রির বীজ। শয়তান এই বীজ নির্বোধ লোকদের হৃদয়ে বপন করিয়া থাকে। যে-সকল মূর্খ নিজকে বুদ্ধিমান বলিয়া মনে করে, শয়তান এইরূপেই তাহাদিগকে পথভ্রান্ত করে। শয়তান ভাল কথার মন্দ অর্থ বাহির করিয়া দেয়। ইহাতে নির্বোধ লোকেরা প্রতারিত হয়; কারণ তদ্রূপ অর্থ বাহির করাকেই তাহারা বুদ্ধিমানের কাজ বলিয়া মনে করে। এই নির্বোধদের উক্তি

এইরূপ। মনে কর, কোন ব্যক্তি বলে–"যে-ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে পাইয়াছে, সে সবই পাইয়াছে। সুতরাং আল্লাহ্‌কে পরিত্যাগ কর, তাহা হইলেই অভাবী হইতে পারিবে।" যাহাই হউক, যে-ব্যক্তি পূর্ণভাবে ইবাদত করিতে থাকে, সে-ই ফকীর। যেমন ঈসা আলায়হিস্ সালাম বলেন–"ইবাদত আমার নিজস্ব নহে, ইহার উপর আমার কোন ক্ষমতাও নাই, তথাপি আমি ইহাতে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছি।" যাহাই হোক, সূফীগণ যাহাকে ফকীর বলিয়া অভিহিত করেন, তাহার ব্যাখ্যা করা এখানে উদ্দেশ্য নহে। পক্ষান্তরে সর্ববিষয়ে অভাবগ্রস্ত; সুতরাং সর্বতোভাবে অভাবী; এ-কথার ব্যাখ্যা করাও উদ্দেশ্য নহে। বরং কেবল ধনের দিকে মানুষ যে অভাবী হয়, শুধু ইহাই এ-স্থলে বর্ণিত হইবে।

ফকীরের শ্রেণীভেদ–লক্ষ লক্ষ অভাবের মধ্যে মানব জীবন যাপন করে। ধন ইহাদের অন্যতম। ধনের অভাব হওয়ার কারণ হইল, ধন হস্তগত না হওয়া বা ইচ্ছাপূর্বক ধন পরিত্যাগ করা। যে-ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক ধন পরিত্যাগ করে, তাহাকে যাহিদ বা সংসার-বিরাগী বলে। যে-ব্যক্তি আদৌ ধন পায় নাই, তাহাকে ফকীর বলে। ফকীর তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। (১) যাহার ধন নাই; কিন্তু উপার্জন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। এমন ব্যক্তিকে লোভী ফকীর বলে। (২) যে-ব্যক্তি ধন উপার্জনের চেষ্টা করে না; আবার বিনা-চেষ্টায় হাতে আসিলে ফেলিয়াও দেয় না; কেহ দিলে গ্রহণ করে, না দিলেও সন্তুষ্ট থাকে, এরূপ ব্যক্তিকে 'ফকীরে কানে' (তুষ্ট ফকীর) বলে। (৩) যে-ব্যক্তি ধনার্জনে চেষ্টা করে না, কেহ দিলেও গ্রহণ করে না, এমন কি ধনের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে, তাহাকে যাহিদ (সংসার-বিরাগী) বলে।

প্রথমে দরিদ্রতার ফযীলত বর্ণনা করা হইবে এবং তৎপর সংসার-বিরাগের ফযীলত প্রদর্শিত হইবে। কারণ, ধনে লোভ সত্ত্বেও ধন হইতে বঞ্চিত থাকা একটি ফযীলতের কাজ।

অভাবগ্রস্ততার ফযীলত–অভাবগ্রস্ততার এত ফযীলত যে, আল্লাহ্ তা'আলা لِلْفُقَرَاءِ الْمُهٰجِرِيْنَ – আয়াতে 'মুহাজির' শব্দের পূর্বে 'ফকীর' শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"বৃহৎ পরিবারবিশিষ্ট পরহেযগার দরিদ্র ব্যক্তিকে আল্লাহ্ ভালবাসেন।" তিনি বলেন–"হে বিলাল, সংসার হইতে যাইবার সময় ধনী না হইয়া যেন দরিদ্র হইয়া যাইতে পার, ইহার চেষ্টা কর।" তিনি বলেন–"আমার উম্মতের মধ্যে দরিদ্র লোক, ধনী লোকের পাঁচ শত বৎসর পূর্বে বেহেশতে প্রবেশ করিবে।"

অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে–"ধনী লোকের চল্লিশ বৎসর পূর্বে দরিদ্রগণ বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে।" এই হাদীসে লোভী দরিদ্রদের কথা বলা হইয়াছে এবং পূর্বোক্ত হাদীসে দরিদ্রতা সত্ত্বেও যাহারা সন্তুষ্ট ও প্রফুল্ল থাকে, তাহাদের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "আমার উম্মতের মধ্যে দরিদ্র লোক উত্তম এবং দুর্বল লোক সর্বাগ্রে বেহেশ্‌তে বিচরণ করিতে থাকিবে।" তিনি বলেন–"আমার দুইটি পেশা আছে। যে-ব্যক্তি এই দুইটিকে ভালবাসে, সে আমাকে ভালবাসে। (ইহাদের) একটি দরিদ্রতা ও অপরটি জিহাদ।"

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত জিবরাঈল আলায়হিস সালাম রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন–"আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে সালাম দিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন–'আপনি যদি ইচ্ছা করেন তবে ভূপৃষ্ঠের সকল পাহাড়-পর্বত স্বর্ণে পরিণত করিয়া দিবেন, যেন আপনি উহাদিগকে যে-স্থানে ইচ্ছা ব্যবহার করিতেন পারেন।" হযরত (সা) বলিলেন–হে জিবরাঈল, আমি ইহা চাহি না। এই সংসার গৃহশূন্য লোকের গৃহ এবং নির্ধন লোকের ধন ও দুনিয়াতে ধন সঞ্চয় করা নির্বোধ লোকের কাজ।" ইহা শুনিয়া হযরত জিবরাঈল (আ) বলিলেন–"হে মুহাম্মদ (সা), সুদৃঢ় কথার উপর আল্লাহ্ আপনাকে অটল রাখুন।" হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম একদা এক নিদ্রিত লোকের পার্শ্ব দিয়া যাইবার সময় তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন–"জাগ্রত হও এবং আল্লাহ্‌র যিকির করিতে থাক।" সেই ব্যক্তি জাগ্রত হইয়া বলিল– "হে ঈসা (আ), আমাকে কি করিতে হইবে? আমি ত দুনিয়াদারদের জন্য দুনিয়া ছাড়িয়া দিয়াছি।" তৎপর ঈসা আলায়হিস সালাম বলেন–"হে ভ্রাতঃ, তবে শয়ন কর, খুব আরামে নিদ্রা যাও।" হযরত মূসা আলায়হিস সালাম একদিন কোন স্থানে যাইবার কালে দেখিলেন, এক ব্যক্তি একটি ইটের উপর মাথা রাখিয়া ভূপৃষ্ঠে শয়ন করিয়া আছে। একটি কম্বল ব্যতীত তাহার আর কিছুই ছিল না। ইহা দেখিয়া হযরত মূসা আলাহিস সালাম নিবেদন করিলেন–"ইহা আল্লাহ্, তোমার এই বান্দার জীবন নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহার নিকট কিছুই নাই।" তৎক্ষণাৎ ওহী আসিল–"হে মূসা, তুমি কি জান না যে, যাহাকে আমি অধিক ভালবাসি, তাহাকে দুনিয়া হইতে সম্যকরূপে বিমুখ রাখি?"

হযরত আবূ রাফে' রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন–" রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের গৃহে একদা একজন মেহমান আসিল। সেই সময় তাঁহার গৃহে খাদ্য কিছুই ছিল না। হযরত (সা) আমাকে বলিলেন–'অমুক ইয়াহূদীর নিকট যাইয়া কিছু আটা ধারে আন।' আমি ঐ ইয়াহূদীর নিকট গেলাম। কিন্তু সে দিবে না বলিয়া শপথ করিল। ফিরিয়া আমি হযরত (সা)-কে ইহা জানাইলাম। তিনি বলিলেন–"আল্লাহ্র শপথ, আকাশ ও পৃথিবীতে আমি আমীন (বিশ্বস্ত)। ইয়াহূদী ধার দিলে আমি অবশ্যই ইহা পরিশোধ করিতাম। এখন আমার এই বর্মটি লইয়া গিয়া তাহার নিকট বন্ধক রাখিয়া কিছু আটা আন।" আমি হযরত (সা)-এর বর্মটি বন্ধক রাখিলাম। এই সময় হযরত (সা)-এর মন প্রফুল্ল করিবার উদ্দেশ্যে এই আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ –

لَاتَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَامَتَّعْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا الاية –

অর্থাৎ "হে মুহাম্মদ (সা) বহু সম্প্রদায়কে ধনৈশ্বর্য দান করত তাহাদের পার্থিব জীবনের শোভা আমি বৃদ্ধি করিয়াছি। আপনি সেই দিকে ভ্রূক্ষেপ করিবেন না। উহা তাহাদের বিপদের কারণ হইয়াছে। আপনার জন্য আল্লাহ্র নিকট যে-বস্তু আছে, তাহা অতীব শ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী।" (সূরা তাহা, ৮ রুকূ, ১৬ পারা।)

হযরত কা'বুল আহ্বার রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন যে, হযরত মূসা আলায়হিস সালামের উপর ওহী অবতীর্ণ হইল– "তুমি দরিদ্রতায় নিপতিত হইলে বলিও مَرْحَبًا بِشِعَارِ الصَّالِحِيْنَ – অর্থাৎ "ধন্য দরিদ্রতা! তুমি পুণ্যাত্মা-লোকদের নিদর্শন।" রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "আমাকে যখন দোযখ দেখানো হয়, তখন অধিকাংশ দোযখবাসীকে ধনী দেখিতে পাইলাম এবং আমাকে যখন বেহেশ্ত দেখানো হয় তখন অধিকাংশ বেহেশ্তবাসীকে অভাবগ্রস্ত ও দরিদ্র দেখিতে পাইলাম।" তিনি আরও বলেন–"আমি বেহেশ্তে অতি অল্পসংখ্যক স্ত্রীলোককে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম–'তাহারা কোথায়?' উত্তর হইল–

شَغَلَهُنَّ الْاَحْمَرَانِ الذَّهَبُ وَالزَّعْفَرَانِ – অর্থাৎ "অলঙ্কার ও রঞ্জিত বেশভূষা তাহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।" বর্ণিত আছে যে, একজন পয়গম্বর নদী তীর দিয়া গমনকালে দেখিতে পাইলেন, এক ধীবর আল্লাহ্র নাম লইয়া জাল ফেলিয়াছে, অথচ জালে মাছ বাধিতেছে না। কিন্তু অপর এক ধীবর শয়তানের নাম লইয়া জাল ফেলিতেছে, অথচ তাহার জালে প্রচুর মাছ বাধিতেছে। ইহা দেখিয়া পয়গম্বর (আ) নিবেদন করিলেন–"ইয়া আল্লাহ্, এ-সমস্তই তোমার আদেশে হইতেছে। কিন্তু ইহাতে কি রহস্য আছে, বুঝিতে পারিতেছি না।" বেহেশ্ত ও দোযখে ঐ ধীবরদ্বয়ের স্থান উক্ত পয়গম্বর (আ)কে দেখাইবার জন্য আল্লাহ্ ফিরিশতাকে আদেশ করিলেন। তৎপর তিনি দেখিতে পাইলেন যে, প্রথম ধীবরের স্থান বেহেশতে এবং দ্বিতীয় ধীবরের স্থান দোযখে। ইহা দেখিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইলেন।

রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"ধনৈশ্বর্যের কারণে নবীগণের মধ্যে হযরত দাউদ আলায়হিস সালামের পুত্র হযরত সুলায়মান আলায়হিস সালাম ও আমার সাহাবাগণের মধ্যে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) সর্বশেষে বেহেশতে প্রবেশ করিবে।" হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম বলেন–"ধনী লোক বহু কষ্টে বেহেশতে যাইবে।" রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"আল্লাহ যাহাদিগকে ভালবাসেন, তাহাদিগকে বিপদাপদে নিপতি করেন এবং যাহাদিগকে অত্যন্ত ভালবাসেন, তাহাদিগকে তিনি 'ইফতিনা' বলেন।" সাহাবাগণ (রা) নিবেদন করিলেন–"হে আল্লাহ্র রাসূল, ইফতিনা কাহাকে বলে?" তিনি বলিলেন–"যে ব্যক্তি একেবারে নির্ধন এবং পরিবার-পরিজনহীন।" হযরত মূসা আলায়হিস সালাম নিবেদন করিলেন–"ইয়া আল্লাহ্, তোমার সৃষ্টির মধ্যে কোন্ ব্যক্তি তোমার বন্ধু? আমিও তাহদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিব।" আল্লাহ্ বলিলেন–"যে-ব্যক্তি একেবারে নির্ধন।" রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, একে অপরের নিকট যেন কৃতকর্মের কৈফিয়ত প্রদর্শন করে, দরিদ্রগণের নিকট তদ্রূপ কৈফিয়ত প্রদর্শন করিয়া কিয়ামত দিবস আল্লাহ্ বলিবেন–"হে আমার বান্দাগণ, দুনিয়াতে তোমাদিগকে ধন না দেওয়ার উদ্দেশ্য এই ছিল না যে, তোমাদিগকে হেয় ও তুচ্ছ করিয়া রাখিব, বরং তোমরা যেন আমার নকিট হইতে মহাপুরস্কার ও সম্মান লাভ কর, এইজন্যই তোমাদিগকে দরিদ্র করিয়া রাখিয়াছিলাম। অদ্য

এই জনতার সারিতে সারিতে তোমরা প্রবেশ কর এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা আমার সন্তুষ্টি লাভের আশায় তোমাদিগকে অন্ন-বস্ত্র দান করিয়াছে, তাহাদিগকে হাতে ধরিয়া টানিয়া লইয়া আইস। কেননা, তাহাদিগকে আমি তোমাদের সহায়ক করিয়াছিলাম।" সেই দিন সকল লোক ঘর্মে নিমজ্জিত থাকিবে। কিন্তু দরিদ্রগণ জনতার মধ্যে প্রবেশ করিবে এবং দুনিয়াতে যাহারা তাহাদের প্রতি উপকার করিয়াছিল তাহাদিগকে হাতে ধরিয়া টানিয়া লইয়া আসিবে।

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"দরিদ্রদের উপকার কর এবং তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব রাখ। কারণ, তাহাদের সম্বল পথে রহিয়াছে।" সাহাবাগণ (রা) নিবেদন করিলেন–"হে আল্লাহ্‌র রাসূল ইহা কি?" তিনি বলিলেন–"কিয়ামতের দিন দরিদ্রের প্রতি আদেশ হইবে যে, যাহারা দুনিয়াতে তোমাদিগকে এক লুক্‌মা অন্ন, এক ঢোক পানি, একখণ্ড বস্ত্র দিয়াছে, তাহাদিগকে হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া বেহেশতে চলিয়া যাও।" হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"যে সময় লোকে ধন-সম্পত্তি সঞ্চয় ও অট্টালিকাদি নির্মাণে লিপ্ত হইবে এবং দরিদ্রগণকে শত্রু জ্ঞান করিবে তখন আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে চার প্রকার বিপদে নিপতিত করিবেন– (১) দুর্ভিক্ষ, (২) রাজার অত্যাচার, (৩) বিচারকের অবিচার ও (৪) শত্রু ও কাফিরদের পরাক্রম।" হযরত ইব্‌নে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন–"যে-ব্যক্তি কাহাকেও দরিদ্রতার জন্য তুচ্ছ জ্ঞান করে এবং ধনের জন্য সম্মানের পাত্র বলিয়া মনে করে, সেই ব্যক্তি (আল্লাহ্‌র) অভিশপ্ত।" বুযুর্গগণ বলেন যে, হযরত সুফিয়ান সাওরীর (র) দরবারে ধনীগণ যেরূপ লাঞ্ছিত হইত তদ্রূপ কোথাও হইত না। কারণ, তিনি তাহাদিগকে সম্মুখে সারিতে স্থান দিতেন না; দরিদ্রদিগকে তাঁহার নিকটে বসাইয়া ধনীদিগকে সকলের পশ্চাতের সারিতে রাখিতেন। লুকমান স্বীয় পুত্রকে বলেন–"ছিন্ন বস্ত্র পরিহিত দরিদ্র ব্যক্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান করিও না। কারণ, তাহার আল্লাহ এবং তোমার আল্লাহ এক ও অভিন্ন।"

হযরত ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌নে মু'আয (রা) বলেন–"দরিদ্রতাকে লোকে যেমন ভয় করে, দোযখকে তদ্রূপ ভয় করিলে দরিদ্রতা ও দোযখ উভয় হইতে সে নির্ভয় হইত; দুনিয়া যেরূপ অন্বেষণ করে বেহেশ্‌ত তদ্রূপ অন্বেষণ করিলে উভয়টিই সে পাইত এবং বাহিরে অপরকে যেরূপ ভয় করে, অন্তরে আল্লাহ্‌কে সেরূপ ভয় করিলে সে উভয় জগতে সৌভাগ্যবান হইত।" এক ব্যক্তি দশ সহস্র

স্বর্ণমুদ্রা উপঢৌকনস্বরূপ হযরত ইব্‌রাহীম আদ্‌হামের (র) নিকট উপস্থিত করিল। কিন্তু তিনি ইহা গ্রহণ করিলেন না। সেই ব্যক্তি অনেক অনুরোধ-উপরোধ করিলে তিনি বলিলেন–"তুমি কি মনে কর, এই অর্থের বিনিময়ে দরিদ্রের তালিকা হইতে আমি আমার নাম কাটাইয়া ফেলিব? আমি কখনই ইহা করিব না।" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হাকে বলেন–"কিয়ামত-দিবস আমার সহিত থাকিতে চাহিলে দরিদ্রের ন্যায় জীবন যাপন কর, ধনীদের ভালবাসা অর্জন কর এবং তালি লাগাইবার পূর্বে বস্ত্র পরিত্যাগ করিও না।'

অল্পে পরিতুষ্ট ফকীরের ফযীলত– রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"আল্লাহ্ যাহাকে ইসলাম ধর্মের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং অভাব মোচনের উপযোগী ধন দিয়াছেন, আর ইহাতে যে সন্তুষ্ট থাকে, তবে সেই ব্যক্তি সৌভাগ্যবান।" তিনি বলেন–"হে দরিদ্রগণ, অকপট মনে দরিদ্রতায় সন্তুষ্ট থাক। তাহা হইলে দরিদ্রতার সওয়াব পাইবে; অন্যথায় সেই সওয়াব হইতে বঞ্চিত থাকিবে। এই হাদীসে ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, দরিদ্রতার সওয়াব হইতে লোভী দরিদ্র বঞ্চিত থাকিবে। কিন্তু অন্যান্য বহু হাদীসে প্রকাশ্যভাবে বলা হইয়াছে যে, তদ্রূপ সওয়াব পাইবে। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "প্রত্যেকটি বস্তুর এক একটি কুঞ্জি আছে এবং সবরকারী দরিদ্রদের প্রতি ভালবাসা বেহেশতের কুঞ্জি। কেননা তাহারা কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে উপবেশ করিবে।" তিনি বলেন–"নিজের নিকট যাহা আছে, তাহাতেই যে-দরিদ্র পরিতুষ্ট থাকে এবং আল্লাহ্ যে-জীবিকা দান করেন, ইহাতেই যে দরিদ্র সন্তুষ্ট হয়, তাহাকে আল্লাহ্ সর্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসেন।" তিনি বলেন যে, কিয়ামতের দিন ধনী-দরিদ্র সকলেই বলিবে–"হায়, দুনিয়াতে যদি নিজের জীবনধারণের উপযোগী খাদ্যের অতিরিক্ত না পাইতাম।"

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইসমাঈল আলায়হিস সালামের প্রতি ওহী অবতীর্ণ করিলেন–"ভগ্নহৃদয় লোকের নিকটে আমাকে অনুসন্ধান কর।" তিনি নিবেদন করিলেন–"তদ্রূপ ব্যক্তি কে?" আল্লাহ বলিলেন–"সবরকারী দরিদ্রগণ।" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, কিয়ামত-দিবস আল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করিবেন–"আমার খাস ও প্রিয় বান্দাগণ কোথায়?" ফিরিশ্‌তাগণ নিবেদন করিবে–"তাহারা কে?" আল্লাহ্ বলিবেন–"তাহারা মুসলমান দরিদ্র, যাহারা আমার দানে সন্তুষ্ট ছিল। তাহাদিগকে বেহেশ্‌তে লইয়া

যাও।" যে-সময় লোক হিসাব-নিকাশে ব্যস্ত থাকিবে, সে সময় তাহারা বেহেশতে চলিয়া যাইবে। হযরত আবূ দরদা রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন–"ধনের বৃদ্ধি দেখিয়া যে-ব্যক্তি আনন্দিত হয়, কিন্তু পরমায়ু প্রতিক্ষণ কমিতেছে বলিয়া দুঃখিত হয় না, তাহার বুদ্ধি বিকারগ্রস্ত হইয়াছ। সুব্হানাল্লাহ্, পরমায়ু কমিয়া যাইতেছে, এমতাবস্থায় ধন বৃদ্ধি পাইলে কি লাভ?" হযরত আমের ইব্নে কাইস (র) শাক-রুটি খাইতেছেন দেখিয়া এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন–"হে আমের দুনিয়ার এ-সামান্য দ্রব্যে তুমি পরিতুষ্ট হইয়াছ? তিনি বলিলেন– আমি এমন লোক দেখিয়াছি যাহারা ইহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট ও সামান্য পদার্থে পরিতুষ্ট আছে।" সেই ব্যক্তি বলিল–"তেমন লোক আবার কাহারা?" তিনি বলিলেন–"যাহারা আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়া লইয়াছে, তাহারাই ইহা অপেক্ষা নিকৃষ্টতম বস্তুতে পরিতুষ্ট হইয়া থাকে।" হযরত আবূ যর রাযিয়াল্লাহু আন্হু একদা কতক লোকের সহিত উপবেশন করত কথাবার্তা বলিতেছিলেন। এমন সময় তাঁহার পত্নী আসিয়া বলিলেন–"আপনি ত এ-স্থানে বসিয়া রহিয়াছেন; কিন্তু আল্লাহ্র শপথ, গৃহে আজ কিছুই নাই।" তিনি বলিলেন–"ওহে মহিলা, আমার সম্মুখে বিপদে পরিপূর্ণ অতি দুর্গম পথ রহিয়াছে এবং দুনিয়ার বোঝা যাহার কম হইবে, সেই-ই এই পথ অতিক্রম করিয়া যাইবে।" ইহা শুনিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহার স্ত্রী গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

কৃতজ্ঞ ধনী অপেক্ষা ধৈর্যশীল দরিদ্র উৎকৃষ্ট–ধৈর্যশীল দরিদ্র ও কৃতজ্ঞ ধনীর মধ্যে কে উৎকৃষ্ট, এ-সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কিন্তু ধৈর্যশীল দরিদ্রই যে উৎকৃষ্ট, ইহাতে কোন ভুল নাই। উপরে যে-সকল হাদীস বর্ণিত হইয়াছে তৎসমুদয়ই এই কথার প্রমাণ। উহার রহস্য এই–যে বস্তু আল্লাহ্র যিকির ও তাঁহার মহব্বতের পথে প্রতিবন্ধকস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়, তাহা মন্দ। কাহারও পক্ষে দরিদ্রতা এই পথে বাধা সৃষ্টি করে, আবার কাহারও পক্ষে ধন অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। ফলকথা এই যে, অভাব মোচনের পরিমিত ধন একেবারে ধনশূন্যতা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এই পরিমাণ ধন দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত নহে; বরং পরকালের পাথেয়রূপে পরিগণিত। এইজন্যই রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম প্রার্থনা করিতেন–"ইয়া আল্লাহ্, মুহাম্মদ (সা)-এর পরিবার-পরিজনকে অভাব মোচনের উপযোগী জীবিকা দান কর।" অভাব মোচনে যে পরিমাণ ধনের আবশ্যক তদপেক্ষা অধিক ধন না পাইয়াই মঙ্গল। লোভ ও পরিতুষ্টি বিষয়ে যখন ধনী ও দরিদ্র উভয়ের অবস্থা একরূপ হয় তখন ধন সম্বন্ধে উপরিউক্ত মন্তব্য প্রযোজ্য।

লোভী ধনী অপেক্ষা লোভী দরিদ্র উৎকৃষ্ট– লোভী দরিদ্র এবং লোভী ধনী উভয়ই ধনাসক্তিতে ঘুরিয়া ফিরিতেছে ও ধন উপার্জনের জন্যই তাহারা ব্যাপৃত রহিয়াছে। কিন্তু দরিদ্র ব্যক্তি আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও ধন উপার্জনে অক্ষম হইলে তাহার মন ভাঙ্গিয়া পড়ে। বিফল পরিশ্রম-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছে বলিয়া সংসারের প্রতি তাহার ঘৃণা জন্মে। মুসলমানের অন্তরে যে পরিমাণে সংসারাসক্তি হ্রাস পায়, আল্লাহ্র প্রতি মহব্বত সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। তখন দুনিয়া তাহার নিকট কারাগারে পরিণত হয়। এই কথা সে ভালরূপে উপলব্ধি করিতে না পারিলেও মৃত্যুকালে দুনিয়ার প্রতি তাহার মনের আকর্ষণ অত্যন্ত হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। অপরপক্ষে ধনী ব্যক্তি দুনিয়ায় উন্নতি করিতে থাকে এবং তৎসঙ্গে তাহার মনে সংসারাসক্তি বৃদ্ধি পায়। ফলে সংসার ছাড়িয়া যাওয়া তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া পড়ে। সুতরাং মৃত্যুকালে লোভী দরিদ্র ও লোভী ধনীর অবস্থার মধ্যে বিরাট প্রভেদ দেখা যায়। এমন কি ইবাদত ও মুনাজাতের সময়ও এইরূপ পার্থক্য ঘটে। কারণ, দরিদ্র ব্যক্তি ইবাদত এবং মুনাজাতে যে আনন্দ পায়, ধনীর ভাগ্যে তাহা কখনও ঘটে না। ধনীর যিকির কেবল রসনার অগ্রভাগ ও মনের বাহির হইতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। মানব-হৃদয় ঘাত-প্রতিঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ না হইলে এবং দুঃখাগ্নিতে দগ্ধ না হইলে আল্লাহ্র যিকিরের মাধুর্য ইহাতে উদ্ভব হয় না।

তুষ্ট ধনী অপেক্ষা তুষ্ট দরিদ্র উৎকৃষ্ট–ধনী এবং দরিদ্র উভয়েই নিজ নিজ অবস্থায় পরিতুষ্ট থাকিলেও ধনী অপেক্ষা দরিদ্র ব্যক্তিই উৎকৃষ্ট। কিন্তু ধনী ব্যক্তি যদি স্বীয় ধনে কৃতজ্ঞ ও পরিতুষ্ট থাকে, ধন অপহৃত হইলে দুঃখিত না হয়, বরং পূর্বের ন্যায় আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে এবং কৃতজ্ঞতা ও পরিতৃপ্তির প্রভাবে তাহার মন পবিত্র হইয়া উঠে, তৎসঙ্গে সংসারাসক্তি ও পার্থিব সুখসম্ভোগে তাহার হৃদয় কলুষিত না হয়; অপরপক্ষে দরিদ্র ব্যক্তি যদি ধন-লোভী হয়, লোভে তাহার মন দুষিত হয় বটে, কিন্তু দুঃখকষ্টে জর্জরিত হইয়া হৃদয় পরিষ্কার ও সংশোধিত হইয়া উঠে। এমতাবস্থায় পরিতুষ্ট ধনী ও লোভী দরিদ্রের অবস্থা প্রায় সমান সমান হইয়া পড়ে। আর এতদুভয়ের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট কতটুকু প্রিয় বা অপ্রিয়, ইহা দুনিয়ার প্রতি তাহাদের অনাসক্তি বা আসক্তি দ্বারা নির্ণীত হয়।

লোভী দরিদ্র অপেক্ষা অনাসক্ত ধনী উৎকৃষ্ট–ধন থাকা বা না থাকা যদি ধনী ব্যক্তির নিকট সমান বলিয়া গণ্য হয়, ধনের প্রতি তাহার মন সম্পূর্ণরূপে

অনাসক্ত থাকে এবং হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্হার ন্যায় কেবল পরের অভাব মোচনের উদ্দেশ্যেই সে ধন রাখিয়া থাকে। তবে এমন ধনীর অবস্থা লোভী দরিদ্রের অবস্থা অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার অবস্থা এই ছিল যে, একদা তিনি লক্ষ মুদ্রা গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন। সেই দিন তিনি রোযা রাখিয়াছেন, গৃহে ইফ্তারের জন্য ব্যঞ্জনাদি ছিল না; অথচ তিনি একটি মুদ্রা মূল্যের গোশ্ত খরিদ করেন নাই। কিন্তু ধনী ব্যক্তি যদি এইরূপ উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত না হয় এবং লোভী দরিদ্র ও পরিতুষ্ট ধনীর মানসিক অবস্থা সমান সমান থাকে তবে দরিদ্র ব্যক্তিই উত্তম। কেননা, এমন ধনী ব্যক্তি সদ্কা ও খয়রাত অপেক্ষা অপর কোন উৎকৃষ্ট কার্য সম্পন্ন করে না।

দরিদ্রের ত্রিবিধ সৌভাগ্য ও মর্তবা–হাদীস শরীফে উক্ত আছে যে, দরিদ্রগণ এক প্রতিনিধি দ্বারা রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সমীপে এই নিবেদন জানাইল–"ইহকাল ও পরকালের সমস্ত পুণ্য ত ধনী লোকেরা লুটিয়া লইল; তাহারা দান-খয়রাত করে, যাকাত দেয় এবং হজ্ব ও জিহাদ করে। আমরা এই সকল করিতে পারি না।" হযরত (সা) দরিদ্রগণের দূতকে সাদরে অভ্যর্থনা করত বলিলেন–

مَرْحَبًا بِكَ وَبِمَنْ جِئْتَ عِنْدَهُمْ –

অর্থাৎ "তুমি এবং তুমি যাহাদের পক্ষ হইতে আসিয়াছ, তাহারা ধন্য। আমি তাহাদিগকে ভালবাসি। তুমি তাহাদিগকে যাইয়া বলিবে–যাহারা আল্লাহ্র সন্তোষ লাভের আশায় দরিদ্রতায় ধৈর্য অবলম্বন করে, তাহাদের মর্যাদার তিনটি স্তর আছে, যাহা ধনীগণ পাইবে না। প্রথম বেহেশ্তে এমন উচ্চ প্রাসাদ আছে যাহাকে দুনিয়াবাসিগণ যেরূপ নক্ষত্ররাজি দেখিয়া থাকে, বেহেশ্তবাসিগণ তদ্রূপ দেখিবে। আর এই স্তরে দরিদ্র পয়গম্বর, দরিদ্র মুসলমান, দরিদ্র শহিদগণ ব্যতীত আর কেহই যাইতে পারিবে না। দ্বিতীয়, দরিদ্রগণ ধনীদের পাঁচশত বৎসর পূর্বে বেহেশতে যাইবে। তৃতীয়, দরিদ্র ব্যক্তি যদি একবার এই কলেমা পড়ে–

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ –

এবং ধনী লোকও ইহা একবার পড়িয়া দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা গরীব-দুঃখীদের মধ্যে

বিতরণ করিয়া দেয় তথাপি ধনী ব্যক্তি দরিদ্রের সমান মরতবা পাইবে না।" হযরত (সা)-এর পক্ষ হইতে এই সুসংবাদ পাইয়া দরিদ্রগণ বলেন– رَضِيْنَا رَضِيْنَا – অর্থাৎ "আমরা সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হইলাম।"

উপরিউক্ত হাদীসের শেষাংশে রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কলেমা সম্বন্ধে এই উদ্দশ্যে বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্র যিকির এমন এক বীজ যাহা দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত, দুঃখকষ্টক্লিষ্ট হৃদয়ে বপন করিলে অতি সহজে অঙ্কুরিত ও বর্ধিত হইয়া থাকে। পার্থিব আনন্দে বিভোর ধনীর হৃদয়ে এই বীজ স্থান পায় না। কঠিন প্রস্তরের উপর পানি পড়িলে যেমন অতি দ্রুতবেগে গড়াইয়া যায় তদ্রূপ ধনীর হৃদয় হইতেও আল্লাহ্র যিকির-স্বরূপ বীজ তেমনিভাবেই গড়াইয়া পড়ে।

মোটের উপর কথা এই যে, যে-ব্যক্তি যত অধিক আল্লাহ্র যিকিরে লিপ্ত রহিয়াছে এবং তাঁহার নৈকট্য ও ভালবাসা লাভ করিয়াছে, সে তত অধিক উচ্চ মর্যাদাপ্রাপ্ত হয়। দুনিয়ার প্রতি মানব-হৃদয়ের আসক্তি যত হ্রাস পায়, আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসা ও তাঁহার স্মরণ-ব্যাপৃতিও তত বৃদ্ধি পায়। ধনী ব্যক্তির হৃদয় ধনজনের চিন্তা হইতে কখনই একেবারে শূন্য হইতে পারে না। এমতাবস্থায় ধনী ও দরিদ্র কিরূপে সমান হইবে? ধনী ব্যক্তি হয়ত মনে করিতে পারে–ধনের চলাচলের পথে আমি একটি মাধ্যমমাত্র, একদিক দিয়া ইহা আসে, অন্যদিক দিয়া চলিয়া যায়। এইজন্যই ধনাসক্তি হইতে আমার মন একেবারে নির্মুক্ত। ধনীর পক্ষে এইরূপ কল্পনা এক বিষম ধোঁকা। কিন্তু সে যদি হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্হার ন্যায় মানসিক অবস্থায় উন্নত হইতে পারে তবে বরং তাহাকে ধনে অনাসক্ত বিবেচনা করা সত্য হইতে পারে। উপরে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি একদা লক্ষ মুদ্রা মৃত্তিকাবৎ তুচ্ছ জ্ঞানে বিতরণ করিয়া দিয়াছিলেন অথচ , নিজের আবশ্যকতার কথা মনে উদয়ও হয় নাই। সংসারে অনাসক্ত থাকিয়া যদি ধন সঞ্চয় সম্ভবপর হইত তবে রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কেন এত সংযমের সহিত দূরে থাকিতেন এবং অপরকেও তদ্রূপ দূরে থাকিতে আদেশ দিতেন? এমন কি দুনিয়াকে মূর্তি ধারণপূর্বক সম্মুখে আসিতে দেখিয়া তিনি 'দূর! দূর! করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলেন।

হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম বলেন–"তোমরা দুনিয়াদারদের ঐশ্বর্যের

দিকে দৃষ্টিপাত করিও না। কারণ, ইহার ছায়া তোমাদের ঈমানের মাধুর্য কাড়িয়া লয়।" এই কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়ার ঐশ্বর্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ইহার মাধুর্য হৃদয়ে জাগিয়া ওঠে এবং আল্লাহ্‌র যিকিরের মাধুর্য বিনষ্ট হয়। কেননা, দুই আসক্তি এক মনে স্থান পায় না। বিশ্বজগতেও দুই প্রকার পদার্থই মৌজুদ আছে–একটি সত্য, অপরটি অসত্য। অসত্যের সহিত যে-পরিমাণে মন লাগাইবে, আল্লাহ্ হইতে সেই পরিমাণে দূরবর্তী হইবে; আবার অসত্যের প্রতি মন যত অনাসক্ত হইবে, আল্লাহ্‌র সহিত মন তত বিজড়িত হইবে। হযরত আবূ সুলায়মান দারানী (র) বলেন–"দরিদ্র ব্যক্তি কোন বস্তুর জন্য চেষ্টা করিয়া না পাইলে হতাশ মনে যে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, ইহা ধনী লোকের সহস্র বৎসরের ইবাদত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" এক ব্যক্তি হযরত বিশ্‌রে হাফীর (র) নিকট নিবেদন করিল–"আমার বিরাট পরিবার, অথচ আমি একেবারে কপর্দকশূন্য। আমার জন্য দু'আ করুন।" তিনি বলিলেন–"যখন তোমার পরিবারের জন্য কোনই খাদ্যদ্রব্য থাকিবে না এবং ইহা সংগ্রহে তুমি অক্ষম হইয়া পড়, আর এই ব্যথায় তোমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়ে, তখন তুমি আমার জন্য দু'আ করিও। কারণ তোমার তৎকালীন দু'আ, আমার দু'আ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইবে।"

অভাবের সময় দরিদ্রের কর্তব্য–অভাবের সময় দরিদ্রের পক্ষে মানসিক সন্তোষ অক্ষুণ্ন রাখা এবং প্রকাশ্যে দুঃখ প্রকাশ না করা কর্তব্য। আন্তরিক অবস্থা অনুসারে দরিদ্র তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। **প্রথম শ্রেণী**–যে-দরিদ্র দরিদ্রতাকে আল্লাহ্-প্রদত্ত একটি প্রকৃত দান মনে করিয়া ইহাতে প্রফুল্ল, আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ থাকে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার প্রিয় পাত্রগণকে দরিদ্রতা দিয়া থাকেন বলিয়া বিশ্বাস করে। **দ্বিতীয় শ্রেণী**–যাহারা দরিদ্রতার উপর সন্তুষ্ট হয় না বটে, কিন্তু আল্লাহ্‌র প্রতি অসন্তুষ্টও নহে। যেমন, কোন ব্যক্তিকে অস্ত্রোপচার করা হইলে তাহার নিকট ইহা ভাল না লাগিলেও অস্ত্র প্রয়োগকারীর প্রতি অসন্তুষ্ট হয় না। এই শ্রেণীর দরিদ্রগণ প্রথম শ্রেণীর সমকক্ষ নহে; তথাপি দরিদ্রতার জন্য দুঃখিত হইয়াও আল্লাহ্‌র উপর সন্তুষ্ট থাকা কম কথা নহে। **তৃতীয় শ্রেণী**–যাহারা দরিদ্রতার জন্য আল্লাহ্‌র প্রতি অসন্তুষ্ট হয়, অসন্তুষ্ট হওয়া হারাম। ইহাতে দরিদ্রতার সওয়াব নষ্ট হইয়া যায়। বরং দরিদ্রদিগকে এই বিশ্বাস রাখা আবশ্যক যে, যাহা করা উচিত, আল্লাহ্ তাহাই করিতেছেন। তাঁহার কার্যে অসন্তুষ্ট হওয়া ও প্রতিবাদ করিবার অধিকার কাহারও নাই। দরিদ্রতার জন্য লোকসমক্ষে দুঃখ

প্রকাশ করাও উচিত নহে; বরং ধৈর্য অবলম্বন করিয়া থাকা আবশ্যক।

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন–"দরিদ্রতা কখন কখন শাস্তির কারণও হইয়া থাকে; মন্দ স্বভাব, অদৃষ্টের নিন্দা এবং আল্লাহ্‌র বিধানের প্রতি বিরক্ত প্রকাশ, ইহার নিদর্শন। আবার দরিদ্রতা কখন কখন সৌভাগ্যের কারণ হয়; সৎস্বভাব, অদৃষ্টের নিন্দা না করা এবং আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা ইহা নির্দশন।" হাদীস শরীফে আছে–"স্বীয় দরিদ্রতা ও অভাব গোপন রাখা একটি পরিপূর্ণ ধনভাণ্ডার।" ধনী লোকের সঙ্গে মেলামেশা না করা, তাহাদের নিকট নিজকে খাট না করা এব! তাহাদিগকে খোশামোদ না করা দরিদ্র ব্যক্তির কর্তব্য। হযরত সুফিয়ান (র) বলেন–"দরিদ্র লোক ধনী লোকের আশেপাশে ঘুরাফেরা করিলে তাহাকে রিয়াকার জ্ঞান করিবে এবং বাদশাহ্‌র আশেপাশে থাকিলে তাহাকে চোর বলিয়া জানিবে।"

দরিদ্র লোকের অপর এক কর্তব্য এই যে, নিজের খরচ যথাসাধ্য কমাইয়া অতি সামান্য হইলেও কোন কোন সময় দান করিবে। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"একটি মুদ্রার সওয়াব কোন সময় লক্ষ মুদ্রার সওয়াব অপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে।" সাহাবাগণ (রা) নিবেদন করিলেন–"কোন্ স্থলে এরূপ হয়?" তিনি বলিলেন–"যে স্থলে কোন ব্যক্তির নিকট দুইটি মুদ্রার অধিক থাকে না, অথচ সে আল্লাহ্‌র রাস্তায় একটি মুদ্রা দান করে, ইহা ক্রোড়পতির লক্ষ মুদ্রা দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

দান গ্রহণের নিয়ম–অন্যের দান গ্রহণের সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য। সন্দেহযুক্ত ও স্বীয় অভাব মোচনের অতিরিক্ত ধন গ্রহণ করা উচিত নহে। যে-দরিদ্র অপর দরিদ্রের অভাব মোচনে নিযুক্ত আছে, সেই ব্যক্তি যদি স্বীয় অভাব মোচনের অতিরিক্ত ধন প্রকাশ্যে গ্রহণ করিয়া গোপনে অপর দরিদ্রের অভাব মোচনে ব্যয় করে, তবে ইহা অতীব উৎকৃষ্ট কাজ। সিদ্দীকগণ ব্যতীত অপর কেহ এইরূপ কাজ করিতে পারে না। যাহার এবংবিধ গোপন দানের ক্ষমতা নাই, তাহার পক্ষে নিজের অভাব মোচনের অতিরিক্ত বস্তু গ্রহণ করা উচিত নহে; ধনস্বামী নিজেই তখন উপযুক্ত অভাবগ্রস্ত লোক অনুসন্ধান করত দান করিবে।

দান গ্রহণ করিবার পূর্বে দাতার সংকল্প জানিয়া লওয়াও অবশ্য কর্তব্য। কারণ, দাতা হয়ত ভালবাসার নির্দশনস্বরূপ হাদিয়া দিতেছে অথবা সদ্‌কা

দিতেছে কিংবা সুনাম অর্জনের উদ্দেশ্যে রিয়ার বশীভূত হইয়া ধন বিতরণ করিতেছে। দাতার মনে যদি গ্রহীতার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের ভাব না থাকে তবে হাদিয়াস্বরূপ যাহা প্রদান করা হয়, তাহা গ্রহণ করা সুন্নত। যদি জানা যায় যে, উপস্থিত পদার্থের মধ্যে কিয়দংশে অনুগ্রহ প্রদর্শনের ভাব আছে আর কিয়দংশে এরূপ ভাব নাই তবে যতটুকুতে অনুগ্রহমূলক ভাব নাই তাহা গ্রহণ করিবে। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট এক ব্যক্তি ঘৃত, পনির ও একটি ছাগল লইয়া আসিল। হযরত (সা) ঘৃত ও পনির গ্রহণপূর্বক ছাগলটি ফেরত দিলেন। হযরত ফত্‌হে মুসেলীর (র) সম্মুখে এক ব্যক্তি পঞ্চাশটি রৌপ্যমুদ্রা উপস্থিত করিল। তিনি একটি মুদ্রা তুলিয়া লইলেন এবং অবশিষ্ট সমস্ত মুদ্রা ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন–"হাদীস শরীফে আছে যে, বিনা প্রার্থনায় কেহ কাহাকেও কিছু প্রদান করিলে সে যদি ইহা প্রত্যাখ্যান করে তবে সে যেন আল্লাহ্‌র দান প্রত্যাখ্যান করিল। হযরত হাসান বসরীও (র) এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এক ব্যক্তি একদা স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রায় পরিপূর্ণ থলিয়া এবং বহু উৎকৃষ্ট রঙিন বস্ত্র তাঁহার জন্য আনয়ন করিল; তিনি ইহার কিছুই গ্রহণ করিলেন না এবং বলিলেন–"যে-ব্যক্তির নিকট ধর্মোপদেশ গ্রহণার্থ লোক সমাগম হয়, সে যদি আগন্তুকদের নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করে, তবে কিয়ামতের দিন সে আল্লাহ্‌র দর্শন লাভ করিবে, কিন্তু আল্লাহ্‌র নিকট কিছুই পাইবে না।" আখিরাতের সওয়াবই তাঁহার মজলিস অনুষ্ঠানের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল; এই কারণেই হয়ত তিনি উহা গ্রহণ করেন নাই। আর তিনি হয়ত বুঝিয়াছিলেন যে, মজলিসের কারণেই সেই ব্যক্তি উপঢৌকনাদি লইয়া আগমন করিয়াছিল এবং তজ্জন্যই তিনি বিশুদ্ধ সংকল্প নষ্ট হইতে দেন নাই। এক ব্যক্তি তাহার বন্ধুকে কিছু দিতে চাহিল। সেই বন্ধু বলিল– "এই উপঢৌকন গ্রহণ করিলে তোমার হৃদয়ে আমার প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি পাইবে কিনা, বিবেচনা করিয়া দেখ। যদি বৃদ্ধি পায় তবে গ্রহণ করিব।"

হযরত সুফিয়ান সাওরী (র) কাহারও নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিতেন না এবং বলিতেন–"যদি বুঝিতাম যে, দাতা ইহা মুখে প্রকাশ করিবে না, তবে আমি গ্রহণ করিতাম।" অর্থাৎ দাতা আমাকে কিছু দিয়া আমার উপকার করিয়াছে বলিয়া যদি গাহিয়া না বেড়াইত তবে আমি গ্রহণ করিতাম। এক বুযুর্গ তাঁহার বিশেষ বন্ধুগণ ব্যতীত অপর কাহারও নিকট হইতে কিছুই গ্রহণ করিতেন

না। বুযুর্গ মাত্রই অপরের অনুগ্রহ-বোঝা বহন করিতে রাযী নহেন। হযরত বিশ্‌রে হাফী (র) বলেন–"আমি হযরত সররী সক্‌তী (র) ব্যতীত অপর কাহারও নিকট হইতে কখনও কোন কিছু চাহি নাই। কারণ, তিনি যে একজন শ্রেষ্ঠ সংসার-বিরাগী ইহা আমার জানা ছিল। তাঁহার হস্ত হইতে কোন বস্তু চলিয়া গেলে তিনি আনন্দিত হইতেন।"

যাহারা রিয়ার উদ্দেশ্যে দান করে, তাহাদের দান গ্রহণ করা উচিত নহে। একজন বুযুর্গ দান গ্রহণ করিলেন না দেখিয়া দাতাগণ তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন–"দাতাদের উপর দয়া করিয়াই আমি ফেরত দিয়াছি। কারণ, আমি গ্রহণ করিলে তাহারা লোকসমক্ষে ইহা বলিয়া বেড়াইত। এইরূপে তাহাদের ধনও যাইত এবং সওয়াবও নষ্ট হইত।"

সদ্‌কাস্বরূপ কেহ কিছু দিলে গ্রহীতা যদি সদ্‌কা লওয়ার উপযুক্ত হয় তবে লইবে; নতুনা ফেরত দিবে। হাদীস শরীফে আছে যে, বিনা-প্রার্থনায় লোকে যদি কাহাকেও কিছু দেয় তবে ইহা আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে প্রেরিত উপজীবিকা। বুযুর্গগণ বলেন যে, কোন কিছু দিতে গেলে যে-ব্যক্তি না লয় সে এমন বিপদে নিপতিত হইবে যে, প্রকৃত অভাবে পড়িয়া চাহিলেও কেহ তখন তাহাকে কিছু দিবে না। হযরত সররী সক্‌তী (র) সর্বদা হযরত ইমাম আহ্‌মদ হাম্বলের (র) নিকট কিছু না কিছু পাঠাইতে থাকিতেন। কিন্তু তিনি কিছুই গ্রহণ করিতেন না। ইহাতে হযরত সররী(র) একদা বলিলেন–"হে আহ্‌মদ, প্রত্যাখ্যানের আপদকে ভয় কর।" হযরত ইমাম আহ্‌মদ হাম্বল (র) বলিলেন–"আচ্ছা ভাই, এখন আমার হাতে এক মাসের উপযোগী দ্রব্যাদি মৌজুদ আছে। তুমি ইহা রাখিয়া যাও। মৌজুদ দ্রব্যাদি শেষ হইলেই তোমার হাদিয়া গ্রহণ করিব।"

বিনা প্রয়োজনে ভিক্ষা হারাম– রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, ভিক্ষা করা কুৎসিত কার্যের অন্তর্ভুক্ত এবং বিনা প্রয়োজনে কুৎসিত কার্য বৈধ হয় না। তিনটি কারণে ভিক্ষা করা ঘৃণিত কার্যের অন্তর্গত। **প্রথম কারণ**–নিজের অভাব প্রকাশ করিলে আল্লাহ্‌র বিধানের প্রতি নিন্দা করা হয়। কেননা, ভৃত্য অন্যের নিকট কিছু চাহিলে সে যেন স্বীয় প্রভুর নিন্দা করিল। কিন্তু নিতান্ত অভাবের তাড়নায় নিন্দা প্রকাশ না পায়, এমনভাবে চাহিলে এই কুৎসিত কার্যের প্রায়শ্চিত্ত (কাফ্‌ফারা) হইয়া যাইবে। **দ্বিতীয় কারণ**–অপরের নিকট চাহিলে নিজেকে হেয় করা হয় এবং এক আল্লাহ্‌

ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট নিজকে হেয় করা মুসলমানের উচিত নহে। অভাবে পড়িয়াও নিজকে লোকচক্ষে হেয় না করিবার উপায় এই যে, যাহারা অবজ্ঞার চক্ষে দেখিবে না এবং যাহাদের নিকট তুচ্ছও হইতে হইবে না যতদূর সম্ভব এমন বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন বা উদারচিত্ত দয়ালু লোকদের নিকট চাহিবে। আত্মীয়, বন্ধু এবং উদারচিত্ত দয়ালু লোক না থাকিলেও নিতান্ত কঠিন অভাবে পতিত না হইলে অপরের নিকট কিছু চাওয়া উচিত নহে। **তৃতীয় কারণ**–যাহার নিকট চাওয়া হয় তাহাকে কষ্ট দেওয়া হইয়া থাকে। কেননা, দাতা হয়ত লোকনিন্দার ভয়ে, চক্ষু-লজ্জায় বা অপরের আশায় দান করে। এই সকল কারণে দাতা দান করিয়া দুঃখিত হয় এবং আন্তরিক অনুরাগে দেয় না বলিয়া দানের পর অনুতাপ করিয়া কষ্ট পায়। দাতাকে এইরূপ কষ্ট দেওয়ার আপদ হইতে অব্যাহতি লাভের উপায় এই যে, প্রকাশ্যভাবে সোজাসুজি না চাহিয়া বরং ইশারা-ইঙ্গিতে চাহিবে যেন যাহার নিকট চাওয়া হইতেছে, সে যদি বুঝিয়াও বুঝিতে পারে নাই বলিয়া ভান করিতে ইচ্ছা করে, তবে সে ইহার সুযোগ পায়। আবার যদি প্রকাশ্যভাবেই চাহিতে হয়, তবে কোন ব্যক্তি বিশেষের নিকট না চাহিয়া বরং সমবেতভাবে সকলের নিকট চাওয়া উচিত। কিন্তু সে-স্থলে যদি একজন-মাত্র ধনী লোক উপস্থিত থাকে এবং সকলেই তাহার নিকট হইতে পাইবার আশা রাখে; কিন্তু সেই ব্যক্তি না দিলে যদি তিরস্কৃত হয় তবে ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষকে নির্দিষ্ট করিয়া প্রার্থনা করার সমতুল। যে ধনীর উপর যাকাত দেওয়া ওয়াজিব, তাহার নিকট যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত ব্যক্তির জন্য চাওয়া জায়েয আছে এবং নিজে যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত হইলে নিজের জন্য অনুরোধ করাও জায়েয। সেই ধনী ব্যক্তি এই জন্য বিরক্ত হইলেও কোন দোষ নাই।

ধনী ব্যক্তি অপবাদের ভয়ে, লজ্জায় পড়িয়া বা এবংবিধ অন্য কোন কারণে কিছু দিতে চাহিলে ইহা গ্রহণ করা হারাম। কেননা, এইরূপ দান গ্রহণ করা বলপূর্বক কাড়িয়া লওয়ার তুল্য। কিন্তু প্রকাশ্য ফত্ওয়া প্রদানকালে কেবল লোকের উক্তিই বিবেচনা করা হয়; (আন্তরিক ভাবের দিকে লক্ষ্য করা হয় না)। এইরূপ ফত্ওয়া দুনিয়ার রাজা-বাদশাদের আইনে সঙ্গত বলিয়া দুনিয়ার কাজেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু মনের ভাব লইয়া পরকারের বিচার সম্পন্ন হইবে। সুতরাং মনে যখন বুঝা যায়, দাতা অসন্তুষ্ট হইয়া দান করিতেছে তখন সেই দান গ্রহণ করা হারাম। এই পর্যন্ত যাহা বলা হইল, তাহার হইতে জানা গেল যে, যাচ্ঞা করা হারাম। তবে দায়ে পড়িয়া নিতান্ত কঠিন অভাবের চাপে

অন্যের নিকট যাচ্ঞা করা জায়েয আছে। কিন্তু আড়ম্বর, সৌষ্ঠব বৃদ্ধি, উত্তম পানাহার ও সুন্দর সুন্দর পোশাক-পরিচ্ছদের জন্য অপরের নিকট যাচ্ঞা করা মোটেই উচিত নহে।

কাহার পক্ষে যাচ্ঞা করা যায়েয– যে-সকল ব্যক্তি শ্রমসাধ্য কাজ করিতে অক্ষম, অথচ একেবারে কপর্দকশূন্য, উপার্জনের কোন পন্থা বা শিল্প-ব্যবসাও জানে না, এমন লোক যাচ্ঞা করিতে পারে। এইরূপ যাহারা ইলমে দীন শিক্ষায় ব্যাপৃত আছে, কোন শিল্পব্যবসা করিবার অবসর পায় না, এমন নিঃস্ব শিক্ষার্থীও অপরের নিকট যাচ্ঞা করিতে পারে। কিন্তু ইবাদতে লিপ্ত ব্যক্তির পক্ষে কাহারও নিকট যাচ্ঞা করা উচিত নহে; বরং স্বীয় অভাব মোচনের জন্য কোন না কোন উপার্জনের পন্থা অবলম্বন করা তাহার পক্ষে ওয়াজিব। কাহারও গৃহে অনাবশ্যক পুস্তক, অতিরিক্ত জায়নামায, বস্ত্র, কোমরবন্ধী ইত্যাদি থাকিলে আহারের অভাব হওয়া মাত্রই এমন ব্যক্তির পক্ষে অপরের নিকট যাচ্ঞা করা হারাম।

কি পরিমাণ বস্তু থাকিলে ভিক্ষা অনুচিত– রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"যে-ব্যক্তি নিজের অধিকারে কিছু দ্রব্য রাখিয়া ভিক্ষা করে, কিয়ামতের দিন সে এমন আকৃতি ধারণ করিবে যে, তাহার বদনমণ্ডলে কেবর অস্থিমাত্র থাকিবে, মাংসপেশী একেবারেই থাকিবে না।" তিনি বলেন–"যে-ব্যক্তি নিজের অধিকারে কোন বস্তু থাকিতে ভিক্ষা করে, ভিক্ষালব্ধ বস্তু অধিকই হউক বা অল্পই হউক তৎসমুদয়ই দোযখের অগ্নি।" লোকে জিজ্ঞাসা করিল–"হে আল্লাহ্র রাসূল, কি পরিমাণ ধন অধিকারে থাকিলে ভিক্ষা করা জায়েয?" এক হাদীসে বর্ণিত আছে, দুই বেলার আহার হাতে থাকিতে ভিক্ষা করা হারাম। অপর এক হাদীসে আছে যে, পঞ্চাশ রৌপ্যমুদ্রা হাতে থাকিলে ভিক্ষা করা হারাম। এই হাদীসের অর্থ হইল পঞ্চাশ রৌপ্যমুদ্রা অধিকারে থাকিলে এক ব্যক্তির সারা বৎসরের ব্যয় চলিতে পারে। যে-দেশে বৎসরের মধ্যে এক নির্দিষ্ট মৌসুমে দান-খয়রাত বিতরণের প্রথা প্রচলিত আছে, সেই দেশে অক্ষম অথচ নির্ধন লোকের অধিকারে পঞ্চাশ রৌপ্যমুদ্রা পরিমিত ধন না থাকিলে এবং তখন অপরের নিকট হইতে সংগ্রহ করত সেই পরিমাণ পূরণ করিয়া না লইলে যদি তাহাকে সম্পূর্ণ বৎসর অভাবগ্রস্ত থাকিতে হয়, তবে সেই পরিমাণ অর্থ অপরের নিকট হইতে যাচ্ঞা করিয়া লওয়া জায়েয আছে।

আর যে-দেশে দরিদ্রগণের পক্ষে প্রত্যহ পাইবার উপায় আছে, সেই দেশে প্রাতঃসন্ধ্যা দুই বেলা পরিমিত আহারের সংস্থান না থাকিলে অপরের নিকট যাচ্ঞা করিবার বিধান আছে। এই-স্থলে যে-দেশে বৎসরে এক নির্দিষ্ট মৌসুমে দান বিতরণ করা হয়, সেই দেশের এক বৎসর এবং যে দেশে প্রত্যহ বিতরণ হয়, সেই দেশের এক দিন সমস্থানীয় বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে।

মানুষের প্রধানত তিন প্রকার দ্রব্যের প্রয়োজন হয়; যথা–(১) অন্ন, (২) বস্ত্র ও (৩) গৃহ। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"তিন বস্তু ব্যতীত দুনিয়াতে মানুষের অপর কোন দ্রব্য পাওয়ার অধিকার নাই;' (যথা)– মেরুদণ্ড সোজা থাকে, এই পরিমাণ খাদ্য; সতর ঢাকিয়া রাখে ও শীতগ্রীষ্ম হইতে দেহকে রক্ষা করে, এই উপযোগী বস্ত্র এবং দেহের স্থান সংকুলান হওয়ার উপযুক্ত গৃহ।" গৃহসামগ্রী ও তৈজসপত্র ঐ তিন প্রকার দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত। মোটা বস্ত্র ও লেপ থাকিলে কম্বল ও শতরঞ্জির জন্য অপরের নিকট প্রার্থনা করা সঙ্গত নহে। মাটির বদনা থাকিলে ধাতুনির্মিত ঘটির জন্য সওয়াল করা অনুচিত। আবশ্যকতা বিভিন্ন প্রকার; ইহার সীমা নির্ধারণ করা যায় না। মোটকথা, নিতান্ত কঠিন অভাব উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত অপরের নিকট যাচ্ঞা করা অনুচিত। কারণ, যাচ্ঞা করা বড় মন্দ কাজ।

মানসিক অবস্থাভেদে দরিদ্রের শ্রেণীবিভাগ– মানসিক অবস্থাভেদে দরিদ্রের নানাশ্রেণী হইয়া থাকে। হযরত বিশরে হাফীর (র) মতে দরিদ্রগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। **প্রথম শ্রেণী**–যাহারা স্বয়ং কাহারও নিকট যাচ্ঞা করে না এবং অযাচিতভাবে কেহ কিছু দিলেও গ্রহণ করে না। এই শ্রেণীর দরিদ্র পবিত্র আত্মাদের সহিত 'ইল্লীনের' সর্ব্বোচ্চ স্থানে থাকিবে। **দ্বিতীয় শ্রেণী**–যাহারা স্বয়ং কাহারও নিকট কিছু চাহে না, কিন্তু অযাচিতভাবে কেহ দান করিলে গ্রহণ করে। এই প্রকার দরিদ্রগণ ফেরদাউসে আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সহিত বাস করিবে। **তৃতীয় শ্রেণী**– যাহারা অন্যের নিকট যাচ্ঞা করে বটে, কিন্তু নিতান্ত কঠিন অভাবের তাড়নায়ই যাচ্ঞা করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর দরিদ্রগণ আস্‌হাবুল ইয়ামীনের অন্তর্ভুক্ত হইয়া বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে।

হযরত ইবরাহীম আদহাম (র) হযরত শকীককে (র) জিজ্ঞাসা করিলেন– "তুমি গৃহত্যাগের সময় নিজ দেশের দরিদ্রদিগকে কি অবস্থায় দেখিয়া আসিয়াছ।" হযরত শকীক (র) বলিলেন–"উত্তম অবস্থায় দেখিয়া আসিয়াছি।

তাহারা কিছু পাইলে আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ দেয়; কিন্তু না পাইলে ধৈর্য অবলম্বন করিয়া থাকে।" হযরত ইব্‌রাহীম আদ্‌হাম (র) বলিলেন–"বলখ দেশ পরিত্যাগের সময় তথাকার কুকুরগুলিকেও আমি ঠিক এই অবস্থায় দেখিয়া আসিয়াছি।" হযরত শকীক (র) জিজ্ঞাসা করিলেন–"আপনার মতে দরিদ্র কিরূপ হওয়া আবশ্যক?" হযরত ইব্‌রাহীম আদ্‌হাম (র) বলিলেন–"দরিদ্র ব্যক্তি কিছু না পাইলে আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ দিবে, আর কিছু পাইলে কিয়দংশ নিজের অভাব মোচনের ব্যয় করিবে এবং অবশিষ্টাংশ অপর দরিদ্রের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিবে।" হযরত শকীক (র) বলিলেন– "ইহাই যথার্থ কথা।"

কোন এক ব্যক্তি বলেন–"আমি হযরত আবূ হাসান নূরী (র)-কে দুই হস্ত বিস্তারপূর্বক যাচ্ঞা করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম। আমি ইহা হযরত জুনায়দ বাগ্‌দাদী (র)-কে জানাইলাম। তিনি বলিলেন–"তুমি কখনও মনে করিও না যে, তিনি মানুষের নিকট হইতে কিছু চাহিবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিয়াছিলেন; এবং হস্ত বিস্তারপূর্বক হয়ত মানুষের মঙ্গলের জন্য তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা জানাইতেছিলেন, যেন তাহাদের কল্যাণ হয় এবং তাহাদের দ্বারা তাঁহার নিজের কোন অনিষ্ট না ঘটে।" এই কথা বলিয়া তিনি আমাকে দাঁড়িপাল্লা আনিতে আদেশ করিলেন। আমি আনয়ন করিলাম তিনি একশত রৌপ্যমুদ্রা ওযন করিয়া এক পাত্রে রাখিলেন। তৎপর বিনা ওযনে ইহার সহিত আরও কিছু সংযোগ করিয়া আমাকে এই সমস্ত হযরত নূরী (র)-কে দিতে বলিলেন। পরিমাণ জানিবার জন্য লোকে ওযন করে; কিন্তু তিনি ওযন করিবার পর বিনা ওযনে ইহার সহিত কতকগুলি মিশাইয়া দিয়া পরিমাণ কেন অনিশ্চিত করিয়া ফেলিলেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া আমি চমৎকৃত হইলাম। যাহাই হউক, আমি মুদ্রাপূর্ণ পাত্রটি লইয়া গিয়া হযরত নূরী (র)-এর সম্মুখে স্থাপন করিলাম। তিনিও দাঁড়িপাল্লা আনিয়া একশত মুদ্রা ওযন করত বলিলেন–"এই একশত মুদ্রা হযরত জুনায়দ (র) কে ফেরত দাও।" আর অবশিষ্ট মুদ্রাগুলি গ্রহণ করিয়া তিনি বলিলেন–"হাঁ, বাস্তবিকই জুনায়দ (র) একজন মহাজ্ঞানী লোক। তিনি দুই দিকেই রজ্জু বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন।" এই কথা শুনিয়া আমি আরও অবাক হইয়া রহিলাম। অপর ঐ একশত মুদ্রা ফিরাইয়া দেওয়ার জন্য হযরত জুনায়দ (র)-এর নিকট গেলাম এবং আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা তাঁহার নিকট বর্ণনা করিলাম। তিনি বলিলেন–"আল্লাহ্‌ই সহায়ক। যে-পরিমাণ মুদ্রা

তাঁহার জন্য ছিল, তাহা তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। আর যাহা আমার জন্য ছিল, তাহা ফেরত দিয়াছেন।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম–"হে মহাত্মন, ইহার অর্থ কি?" তিনি বলিলেন–"পরকালে পুণ্য পাইবার আশায় একশত মুদ্রা দিয়াছিলাম এবং অবশিষ্টগুলি নিঃস্বার্থভাবে কেবল আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে পাঠাইয়াছিলাম। যাহা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ছিল, তাহা তিনি গ্রহণ করিলেন এবং যাহা আমার জন্য ছিল, তাহা ফেরত দিলেন।"

যাহা হউক, তৎকালে দরিদ্র লোক এইরূপ কামিল হইতেন। তাঁহাদের হৃদয় এত পরিষ্কার ছিল যে, অপরের অন্তর্নিহিত গুপ্তভাবও তাঁহারা জানিতে পারিতেন। বর্তমান কালের দরিদ্রগণ তদ্রূপ গুণে গুণান্বিত হইতে না পারিলেও অন্তত উহার আশায় থাকা উচিত। ইহা সম্ভব না হইলে ঐগুলির উপর বিশ্বাস স্থাপন করা কর্তব্য।

সংসার-বিরাগ

সংসার-বিরাগের হাকীকত–এক ব্যক্তি গ্রীষ্মকালে পিপাসার সময় বরফ সংযোগে পানি ঠাণ্ডা করিয়া পান করিবার জন্য কিছু বরফ সংগ্রহ করিল। এমন সময় অপর এক ব্যক্তি আসিয়া স্বর্ণ দিয়া বরফ খরিদ করিতে চাহিলে বরফ-স্বামী চিন্তা করিবে–"বরফ নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী বস্তু; রজনী আসিতে আসিতে সমস্ত গলিয়া যাইবে। পক্ষান্তরে এই স্বর্ণ আমার সহিত চিরজীবন থাকিবে।" এমতাবস্থায় চিরহিতকর স্বর্ণের বিনিময়ে ক্ষণস্থায়ী বরফ পরিত্যাগ করা এবং ইহার লোভ সংবরণ করাকে সংসার-বিরাগ বলে। বরফ সম্বন্ধে উক্ত ব্যক্তির সংসার-বিরাগ যে-কারণে ও যে-প্রকারে জন্মিয়াছিল, দুনিয়া সম্বন্ধে আরিফের সংসারে অনাসক্তি সেই কারণে এবং সেইরূপেই জন্মিয়া থাকে। আরিফ (চক্ষুষ্মান, জ্ঞানী ব্যক্তি) দিব্যচক্ষে দেখিতে পান যে, দুনিয়া চলিয়া যাইতেছে এবং প্রতি পলেই হ্রাস পাইতেছে ও মৃত্যুর সময়ে সব শেষ হইয়া যাইবে। তাঁহারা পরকালের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখেন, ইহা অতি মনোরম চিরস্থায়ী ও অশেষ। ফলে দুনিয়া তাঁহাদের নিকট নিতান্ত তুচ্ছ ও হেয় হইয়া পড়ে। তখন তাঁহারা সংসার-বিরাগী হইয়া দুনিয়া বর্জনপূর্বক ইহার পরিবর্তে পরকাল অবলম্বন করেন। কারণ, পরকাল ইহকাল অপেক্ষা শতসহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ। আরিফের এই অবস্থাকেই যুহ্‌দ বা বৈরাগ্য বলে।

যুহ্‌দের শর্ত–যুহ্‌দের কতকগুলি অপরিহার্য শর্ত আছে; উহা ব্যতীত যুহ্‌দ হইতে পারে না। **প্রথম শর্ত**–শরীয়তমতে যাহা নির্দোষ দুনিয়ার এমন বস্তু পরিত্যাগ করা। কারণ, শরীয়তে যাহা নিষিদ্ধ, তাহা পরিত্যাগ করা ত সকলের উপরই ফরয। **দ্বিতীয় শর্ত**–দুনিয়ার সম্পদ ও ভোগ্যবস্তুর অধিকারী হইয়া উহা উপভোগের পূর্ণ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এই সমস্ত পরিত্যাগ করা; কেননা, যাহার দুনিয়া উপভোগের ক্ষমতাই নাই, সে সংসার-বিরাগী হইতেই পারে না। অথবা, যাহার কিছুই নাই তাহাকে অযাচিতভাবে কেহ দুনিয়ার সুখ-সম্ভোগের বস্তু দান করিলে তাহা গ্রহণ না করা এবং গ্রহণ করিতে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়া দেওয়া। কিন্তু বিনা-পরীক্ষায় কেহ এই উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে কিনা, বুঝা যায় না। সংসার লাভের ক্ষমতা হস্তগত হইলেই মানবের স্বভাব পরিবর্তিত হয়। অনেকে মনে করে, সংসার বর্জনের ক্ষমতা তাহার আছে। কিন্তু হাতে পাইলেই সেই কুহেলিকা ঘুচিয়া যায়। **তৃতীয় শর্ত**–যে-ধন অধিকারে আছে তাহা খরচ করিয়া ফেলা ও ধনের রক্ষণাবেক্ষণ না করা এবং মান-সম্মানেরও কোন পরওয়া না করা। কারণ, পরকালের আনন্দ লাভের আশায় যে-ব্যক্তি ইহকালের সকল আনন্দ ও সুখ-সম্ভোগ পরিত্যাগ করে, সেই ব্যক্তি প্রকৃত সংসার-বিরাগী।

যুহ্‌দ ক্রয়-বিক্রয়ের এক ব্যবসা এবং এই বিক্রয়ে লাভ অপরিসীম; যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মুসলমানদের নিকট হইতে তাহাদের প্রাণ এবং ধন বেহেশতের বিনিময়ে ক্রয় করিয়াছেন।" (সূরা তওবা, ১৪ রুকূ, ১১ পারা।) আল্লাহ্ আবার বলেন ঃ

فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ

অর্থাৎ "অতএব তোমাদের এই ক্রয়-বিক্রয় যাহা (আল্লাহ্‌র সহিত)করিয়াছ তাহাতে আনন্দিত হও।" (সূরা তওবা, ১৪ রুকূ।) ফলকথা এই যে, মুসলমানদের দেহ ও ধন, যাহা অতি নগণ্য এবং প্রতি পলে নষ্ট হইতেছে, তাহা লইয়া আল্লাহ্ ইহার বিনিময়ে মূল্যস্বরূপ অতি মনোরম চিরস্থায়ী বেহেশ্‌ত প্রদান করিতেছেন। সুতরাং এই ব্যবসায়ে মুসলমানদের যে-লাভ হইল তাহা বর্ণনাতীত।

উন্নত শ্রেণীর সংসার-বিরাগী–স্বীয় বদান্যতা মানব-সমাজে প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বা পরকাল ব্যতীত অন্য কিছু পাইবার জন্য দুনিয়া পরিত্যাগ করাকে

'যুহ্দ' বলে না। আবার পরকাল লাভের আশায় ইহকাল পরিত্যাগ করা আরিফের নিকট অতি নিম্ন শ্রেণীর যুহ্দ। বরং তাঁহাদের মতে প্রকৃত সংসার-বিরাগী দুনিয়ার প্রতি যেরূপ উদাসীন থাকেন, আখিরাতের (সুখ-সম্ভোগের) প্রতিও তদ্রূপ উদাসীন থাকেন। কারণ, বেহেশ্‌তেও চক্ষু, উদর, কাম ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু আছে, কিন্তু সংসার-বিরাগী এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ভোগ বস্তুকে অবজ্ঞার চক্ষে অবলোকন করেন এবং নিজকে এই সকলের বহু উর্ধ্বে রাখেন। যে-সকল পদার্থে ইন্দ্রিয় পরিপুষ্ট হয় তাহা পশুগণও ভোগ করিয়া থাকে। সুতরাং সংসার-বিরাগী ব্যক্তি এরূপ ইন্দ্রিয়ভোগ্য পদার্থের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন না। তাঁহারা আল্লাহ্ ব্যতীত ইহকাল ও পরকালের সুখ-সম্পদের কিছু চাহেন না এবং তাঁহারা মারিফাত ও দর্শন লাভ ভিন্ন অপর কোন পদার্থেই পরিতুষ্ট হন না। স্বয়ং আল্লাহ ব্যতীত দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় বস্তু তাঁহাদের দৃষ্টিতে নিতান্ত তুচ্ছ হইয়া পড়ে। একমাত্র আরিফে রব্বানীগণ (অর্থাৎ যাঁহারা আল্লাহ্‌র সম্যক পরিচয়জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাঁহারা) এই শ্রেণীর যাহিদ (সংসার-বিরাগী) হইয়া থাকেন। এইরূপ যাহিদের পক্ষে সাংসারিক ধনৈশ্বর্য হইতে পলায়ন না করারও বিধান আছে। বরং ধন গ্রহণপূর্বক উপযুক্ত স্থানে ব্যয় করা এবং অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেওয়া তাঁহাদের উচিত। হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্হু ইহাই করিতেন। ইসলাম জগতের সমস্ত ধনভাণ্ডার তাঁহার করতলগত ছিল। কিন্তু তিনি তৎপতি সম্পূর্ণ অনাসক্ত ও উদাসীন ছিলেন। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্হার অবস্থাও এইরূপই ছিল। তিনি এক দিন এক লক্ষ মুদ্রা মৃত্তিকাবৎ বিতরণ করিয়া দিলেন; কিন্তু নিজের জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় একটি মুদ্রা মূল্যের গোশ্‌তও খরিদ করিলেন না।

অতএব বুঝা গেল, আরিফের হস্তে লক্ষ মুদ্রা থাকিলেও তিনি প্রকৃত সংসার-বিরাগী থাকিতে পারেন। অপরপক্ষে, যাহার হাতে এক কপর্দকও নাই, তাহাকে সংসার-বিরাগী বলা হয় না। বরং দুনিয়ার প্রতি একেবারে মনক্ষুণ্ন এবং অনাসক্ত থাকাই যুহ্দের চরম বিকাশ। যে-ব্যক্তি যুহ্দের এই উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি ত দুনিয়া অন্বেষণে ব্যাপৃত হন না বা ইহা হইতে পলায়নও করেন না; দুনিয়ার প্রতিকূল আচরণও করেন না, কিংবা ইহার সহিত মিশিয়াও যান না; আবার সংসারকে তিনি ভালও বাসেন না, কিংবা ইহাকে শত্রু বলিয়াও জ্ঞান করেন না। কেননা, কোন পদার্থকে ভালবাসিলে মন যেমন তৎপ্রতি ব্যাপৃত হয়, শত্রু বলিয়া জ্ঞান করিতে গেলেও মন তদ্রূপ ব্যাপৃত হইয়া থাকে।

সুতরাং আল্লাহ্ ব্যতীত যাবতীয় পদার্থের অনুরাগ বা বিরাগ হইতে উদাসীন থাকাই প্রকৃত সংসার-বিরাগ। এই প্রকার সংসার-বিরাগীর নিকট পার্থিব ধনৈশ্বর্য সমুদ্রের পানির ন্যায় এবং স্বীয় হস্ত আল্লাহ্‌র ধনভাণ্ডারের ন্যায় বিবেচিত হয়। আর তাঁহার অধিকারে কত ধন আসিল, কত গেল; বৃদ্ধি পাইল বা কমিয়া গেল; এই সকল চিন্তা হইতে তিনি একেবারে মুক্ত থাকেন। ইহাই যুহ্দের পরাকাষ্ঠা।

এ-স্থলে নির্বোধ লোকেরা বিষম ধোঁকায় পতিত হয়। কারণ, তাহারা পার্থিব ধনৈশ্বর্য পরিত্যাগ করিতে পারে না, অথচ নিজকে উহাতে অনাসক্ত এবং সংসার-বিরাগী বলিয়া মনে করে। কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি তাহাদের ধন, অপর কোন ব্যক্তির ধন বা নদীর পানি অপহরণ করিলে এই ত্রিবিধ হরণ-কার্য দর্শনে যদি তাহাদের মনে একই প্রকার অবস্থা না ঘটিয়া পার্থক্য অনুভূত হয়, তবে বুঝা যাইবে যে, তাহারা নিজদিগকে ধন সম্বন্ধে উদাসীন ভাবিয়া ভুল করিয়াছে এবং তাহাদের মনে ধনাসক্তি গুপ্তভাবে রহিয়াছে। প্রকৃত কথা এই যে, ধন হস্তগত হওয়ার পর ইচ্ছানুরূপ ভোগ করিবার শক্তি থাকা সত্ত্বেও নির্বিকার চিত্তে ইহা দূরে ঠেলিয়া দিয়া সংসারের প্রলোভন হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পারিলে যুহ্দের পরিচয় পাওয়া যায়।

এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে মুবারক (র)-কে যাহিদ (সংসার-বিরাগী) বলিয়া সম্বোধন করিল। তিনি উত্তর দিলেন–"যাহিদ ত হযরত ওমর ইব্নে আবদুল আযীয (র)। সসাগরা ধরার ধনৈশ্বর্য তাঁহার করতলগত। তৎসমুদয় ভোগ করিবার অবাধ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি সংসার-বিরাগী। পক্ষান্তরে আমার হাতে কিছুই নাই। এমতাবস্থায় আমাকে 'যাহিদ' বলা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে?" ইব্নে আবূ লায়লা একদা ইব্নে শব্‌রমাকে বলিলেন–"দেখ ভাই, আবূ হানীফা (র) জোলার ছেলে হইয়া আমার ফতওয়া অগ্রাহ্য করেন।" ইব্নে শব্‌রমা বলিলেন–"জোলার ছেলে বা শরীফ-সন্তান বলিয়া আমি তাঁহার মর্যাদার কোন তারতম্য বুঝি না। কিন্তু আমি এইটুকু জানি যে, দুনিয়ার ধনৈশ্বর্য তাঁহার দিকে দৌড়িয়া আসিতেছে, আর তিনি ইহা হইতে পলায়ন করিতেছেন। অপর পক্ষে দুনিয়া বদন ফিরাইয়া আমাদের নিকট হইতে পলাইতেছে; অথচ আমরা ইহাকে ধরিবার জন্য দৌড়িয়া মরিতেছি।" হযরত ইব্নে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন–"নিম্ন আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আমি বুঝিতে পারি নাই যে, আমাদের মধ্যে কেহ দুনিয়াকে ভালবাসে–

مِنْكُمْ مَنْ يُرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ -

অর্থাৎ "তোমাদের মধ্যে কতক লোক দুনিয়া চায় এবং কতক লোক আখিরাত চাহিয়া থাকে।" (সূরা আলে ইমরান, রুকূ ১৬ পারা ৪।) এক সময় যখন কতিপয় মুসলমান বলিল, কোন্ কার্য আল্লাহ্ ভালবাসেন জানিতে পারিলে আমরা তাহাই করিতাম, তখন আল্লাহ্ এই আয়াত অবতীর্ণ করিলেন ঃ

وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِ اقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اَوِ اخْرُجُوْا مِنْ دِيَارِكُمْ مَافَعَلُوْهُ اِلاَّ قَلِيْلٌ مِّنْهُمْ -

"আর আমি যদি তাহাদের (মানুষের) প্রতি ফরয করিয়া দিতাম যে, তোমরা আত্মহত্যা কর কিংবা স্বদেশ হইতে বহির্গত হইয়া যাও, তবে অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত এই আদেশ কেহই পালন করিত না।" (সূরা নিসা, ৯ রুকূ, ৫ পারা।)

যুহ্দ অবলম্বন না করার কারণ–বরফের বিনিময়ে স্বর্ণ গ্রহণ করা কোন কঠিন কাজ নহে। প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই ইহা করিতে পারে। স্বর্ণের সহিত তুলনায় বরফ যত নিকৃষ্ট, আখিরাতের সহিত তুলনায় দুনিয়া তদপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। কিন্তু তিনটি কারণে মানুষ ইহা বুঝিতে পারে না যথা (১) ঈমানের দুর্বলতা, (২) প্রবৃত্তির প্রবলতা এবং (৩) শিথিলতা ও দীর্ঘসূত্রিতা; অর্থাৎ কাজটি অদ্য না করিয়া কল্য করিব বলিয়া রাখিয়া দেওয়া। লোভ-লালসাদি প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠিলেই এই শিথিলতা ও দীর্ঘসূত্রিতার উদ্ভব হয়। কারণ, লোভনীয় বস্তু সম্মুখে পাইলেই মানুষ ইহা উপভোগের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠে। এইজন্য সে নগদ পার্থিব তুচ্ছ সুখে এমন মুগ্ধ হয় যে, বাকী পারলৌকিক চিরস্থায়ী সুখের কথা একেবারে ভুলিয়া যায়।

যুহ্দের ফযীলত– দুনিয়ার মহব্বতের অপকারিতা ও নিন্দা বর্ণনাকালে যাহা কিছু বর্ণিত হইয়াছে তৎসমুদয়ই যুহ্দের ফযীলতের প্রমাণ। দুনিয়ার মহব্বত মারাত্মক দোষসমূহের অন্যতম এবং যে-সকল গুণের অধিকারী হইলে মানুষ পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে, দুনিয়ার প্রতি বিরক্তি উহাদের অন্যতম। দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি সম্বন্ধে কতিপয় আয়াত ও হাদীস-বাণী এ-স্থলে উল্লেখ করা হইবে।

সংসার-বিরাগের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রশংসা ইহাই যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইহাকে আলিমদের কাজ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ যখন মহাড়ম্বরে শোভাযাত্রাসহ বাহির হইয়াছিল, তখন আলিম ব্যতীত অন্যান্য দর্শকগণ দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিল–"হায়! আমরা যদি এইরূপ প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ধনৈশ্বর্য পাইতাম!" কিন্তু সেই সময় আলিমগণ বলিয়াছিলেন–"ঈমানদারদের জন্য পরকালে যে-পুরস্কার অবধারিত আছে তাহা পার্থিব ধনৈশ্বর্য অপেক্ষা বহুগুণে উৎকৃষ্ট।" যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا -

অর্থাৎ "আর যাহাদিগকে ইলম দেওয়া হইয়াছিল, তাহারা বলিল, তোমাদের প্রতি আক্ষেপ; যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকার্য করিয়াছে, তাহাদের জন্য আল্লাহ্র পুরস্কার উত্তম।" (সুরা কাসাস, ৯ রুকূ, ২০ পারা।) এইজন্যই বুযুর্গগণ বলেন–"যে-ব্যক্তি চল্লিশ দিন পর্যন্তও সংসার-বিরাগী হইয়া থাকিতে পারে, তাঁহার হৃদয়ে হিকমতের প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়।"

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"আল্লাহ্র ভালবাসা পাইতে চাহিলে সংসার-বিরাগী হও।" হযরত হারিসা রাযিয়াল্লাহু আন্হু রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বলিলেন–"আমি সত্যই ঈমানদার।" হযরত (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন–"(তুমি যে ঈমানদার) ইহার প্রমাণ কি?" তিনি বলিলেন–"দুনিয়ার প্রতি আমার মন এমন উদাসীন হইয়া পড়িয়াছে যে, স্বর্ণ ও প্রস্তর আমার নিকট সমান বোধ হয় এবং বেহেশ্‌ত ও দোযখ যেন আমি দেখিতে পাইতেছি।" ইহা শুনিয়া হযরত (সা) বলিলেন–"যাহা তোমার পাইবার ছিল, তাহা পাইয়াছ। এখন ইহা সযত্নে রক্ষা কর।" তৎপর হযরত (সা) বলিলেন–

عَبْدٌ نَوَّرَ اللّٰهُ قَلْبَهٗ অর্থ "উপযুক্ত বান্দা বটে। আল্লাহ তাহার হৃদয়কে আলোকিত করিয়া দিয়াছেন।" যখন এই আয়াত নাযিল হয়–

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ -

(অর্থাৎ আল্লাহ্ যাহাকে হেদায়েত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহার হৃদয় ইসলামের জন্য প্রশস্ত করিয়া দেয়।) তখন সাহাবাগণ (রা) নিবেদন করিলেন–"হে আল্লাহর রাসূল, এই প্রশস্ততা কি?" হযরত (সা) বলিলেন–"ইহা এক প্রকার নূর, হৃদয়ে জন্মে এবং ইহার প্রভাবে হৃদয় প্রশস্ত হইয়া পড়ে।" সাহাবাগণ (রা) আবার নিবেদন করিলেন–"ইহার নিদর্শন কি?" হযরত (সা) বলিলেন–"ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার প্রতি বিরক্ত হইয়া চিরস্থায়ী আখিরাতের দিকে মন নিবিষ্ট হইয়া পড়ে এবং মৃত্যুর পূর্বেই মরণের আয়োজনে প্রবৃত্ত হয়।"

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"আল্লাহ্‌র জন্য যেরূপ লজ্জা রাখা উচিত তদ্রূপ লজ্জা রাখ।" সাহাবাগণ (রা) বলিলেন –"হে আল্লাহর রাসূল, আমরা ত লজ্জা করিয়া থাকি।" হযরত (সা) বলিলেন–"তাহা হইলে যে-ধন ভোগ করিতে পারিবে না, তাহা কেন সঞ্চয় কর এবং যেখানে বাস করিতে পারিবে না, সেখানে কেন গৃহ তৈয়ার কর?" একদা খুত্‌বা প্রদানকালে রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন–"যে-ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' এর সহিত কোন কিছু মিশ্রিত না করিয়া খাঁটিভাবে ইহা লইয়া পরলোকগমন করে, সে বেহেশ্‌তী।" ইহা শুনিয়া হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু নিবেদন করিলেন–"হে আল্লাহ্‌র রাসূল, কোন্ জিনিস ইহার সহিত মিশ্রিত করা উচিত নহে, বুঝাইয়া বলুন।" হযরত (সা) বলিলেন–"দুনিয়া-প্রীতি ও দুনিয়া-অন্বেষণ। কারণ, কোন কোন লোক পয়গম্বরগণের ন্যায় কথা বলে; কিন্তু তাহাদের কার্য ধন-গর্বিত অত্যাচারী লোকের কার্যের ন্যায়। যে-ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' সংসারপ্রীতি ও সংসার-অন্বেষণ হইতে নিষ্কলঙ্ক লইয়া যাইবে, তাহার স্থান বেহেশ্‌তে হইবে।" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"যে ব্যক্তি সংসার-বিরাগী, আল্লাহ্ তাহার হৃদয়ে হিক্‌মতের দ্বার খুলিয়া দেন এবং তাহার রসনা হইতে হিক্‌মতের কথা বাহির করেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে দুনিয়ার ক্ষতি এবং রোগ ও রোগের ঔষধ সম্বন্ধে জানাইয়া দেন এবং পরিশেষে তাহাকে নিরাপদে পৃথিবী হইতে বেহেশতে লইয়া যান।"

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম একদা কোন স্থানে যাইতেছিলেন; পথের পার্শ্বে উষ্ট্রের একটি বৃহৎ পাল ছিল। সমস্ত উষ্ট্রই সুন্দর ও গর্ভবতী ছিল। উষ্ট্র আরবাসীর খুব উৎকৃষ্ট সম্পদ। কারণ, ইহা হইতে প্রচুর

অর্থ, দুগ্ধ, গোশ্‌ত এবং পশম পাওয়া যায়। হযরত (সা) এই উষ্ট্রের পালের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেন। সাহাবাগণ নিবেদন করিলেন–"হে আল্লাহ্‌র রাসূল, এইগুলি ত উত্তম সম্পদ। আপনি ইহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন না কেন?" হযরত (সা) বলিলেন–"ইহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে আল্লাহ্ আমাকে নিষেধ করিয়াছেন এবং তিনি বলেন ঃ

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَامَتَّعْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ الاية –

অর্থাৎ "তাহাদিগকে পার্থিব ধনৈশ্বর্যের যে-শোভা দান করিয়াছি, ইহার দিকে আপনি দৃষ্টপাত করিবেন না।" (সূরা তাহা, ৮ রুকূ, ১৬ পারা) লোকে হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামের নিকট বলিল–"আপনি অনুমতি দিলে আপনার জন্য ইবাদত-গৃহ নির্মাণ করিয়া দেই।" তিনি বলিলেন, "যাও—নদীর পানির উপর গৃহ বানাও।" তাহারা নিবেদন করিল–"পানির উপর কিরূপে গৃহ বানাইব?" তিনি বলিলেন–"দুনিয়ার মহব্বত অন্তরে রাখিয়া ইবাদত করা কিরূপে সম্ভবপর?" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"আল্লাহ্‌র ভালবাসা পাইতে চাহিলে দুনিয়া পরিত্যাগ কর এবং মানুষের ভালবাসা পাইবার ইচ্ছা থাকিলে তাহাদের নিকট যাহা আছে তাহা হইতে হস্ত সঙ্কুচিত করিয়া লও।

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের অন্যতম পত্নী হযরত হাফ্‌সা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা তদীয় পিতা হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর নিকট নিবেদন করিলেন–"বিভিন্ন দেশ হইতে যখন যুদ্ধ-লব্ধ ধনসম্পদ আসে, আপনি উহা হইতে উত্তম বস্ত্র গ্রহণ করত পরিধান করুন এবং উৎকৃষ্ট খাদ্য পাক করাইয়া বন্ধুবান্ধবসহ আহার করুন।" ইহা শুনিয়া হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলিলেন–"হে হাফ্‌সা (রা), স্বামীর অবস্থা স্ত্রী যেমন জানিতে পারে অপর কেহই তেমন জানিতে পারে না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের অবস্থা তুমি অতি ভালরূপেই অবগত আছ। আল্লাহ্‌র শপথ, সত্য কিনা বল দেখি, তিনি যে-কয়েক বৎসর পয়গম্বররূপে জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনি এবং তাঁহার পরিবারবর্গ সকালে তৃপ্তির সহিত আহার করিলে রজনীতে অনাহারে থাকিতেন এবং রজনীতে তৃপ্তির সহিত আহার করিলে দিবসে উপবাস থাকতেন। আল্লাহর শপথ, খয়বার বিজয়ের দিন পর্যন্ত কয়েক বৎসর ধরিয়া তিনি কেবল খোরমাও ক্ষুধা নিবৃত্ত করিয়া আহার করেন নাই। আল্লাহ্‌র শপথ

তুমি জান, একদা খাদ্যদ্রব্য একটি খাঞ্চার উপর স্থাপনপূর্বক তাঁহার সম্মুখে রাখিলে তাঁহার বদনমণ্ডলের বর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গেল; অবশেষে তাঁহার আদেশক্রমে খাদ্যদ্রব্য ভূতলে রাখা হইল। আল্লাহ্‌র শপথ, তুমি অবগত আছ, হযরত (সা) রজনীতে শয্যাগ্রহণকালে একটি কম্বল দুই ভাঁজ করিয়া শয়ন করিতেন। একদা কম্বলটি চারিটি ভাঁজ করিয়া বিছাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহাতে বিছানা অধিক কোমল হইয়া পড়িল। পরদিন হযরত (সা) বলিলেন–'এই কোমল বিছানা আমাকে রজনীর নামায হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছে।" তৎপর হযরত (সা) যেরূপে বিছাইতেন তদ্রূপ বিছাইয়া লইলেন এবং দুই ভাঁজের অধিক দিতে তিনি নিষেধ করিলেন। আল্লাহ্‌র শপথ, তুমি জান, হযরত (সা) কাপড় ধৌত করিবার পর বিলাল (রা) আযান দিলে কাপড় শুষ্ক না হওয়া পর্যন্ত তিনি বাহিরে আসিতে পারিতেন না। কারণ, তাহার দ্বিতীয় কাপড় থাকিত না। আল্লাহ্‌র শপথ, তুমি জান, বনী-যাফর বংশের এক মহিলা হযরতের (সা) লুঙ্গি ও চাদর তৈয়ার করিত। দুইটি একসঙ্গে তৈয়ার হইবার পূর্বে মহিলা একটি বস্ত্র তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিল। হযরত (সা) ইহার এক প্রান্ত কোমরে পেচ দিয়া পরিধানপূর্বক সম্মুখে বন্ধন করত অপর প্রাপ্ত দ্বারা পৃষ্ঠ আচ্ছাদন করিয়া বাহিরে আসিলেন। কারণ, ইহা ব্যতীত তাঁহার নিকট অপর কোন বস্ত্র ছিল না। হযরত হাফ্‌সা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা বলিলেন–"এই সমস্তই আমি জানি।" তৎপর হযরত হাফ্‌সা (রা) ও হযরত ওমর (রা) রোদন করিতে করিতে অচেতন হইয়া পড়িলেন। সংজ্ঞা লাভের পর হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু আবার বলিলেন–"আমার দুই বন্ধু অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এবং হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু আমার পূর্বে পরলোকগমন করিয়াছেন। আমি তাঁহাদের পথে চলিলে তাঁহাদের নিকট যাইতে পারিব। অন্যথায় আমি ভিন্ন পথে পরিচালিত হইব। আমারও তাঁহাদের ন্যায় দুঃখকষ্টের সহিত জীবন যাপন করা উচিত। তাহা হইলে তাঁহাদের সহিত চিরস্থায়ী শান্তি লাভ করিতে পারিব।"

একজন সাহাবী (রা) প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত একজন তাবেয়ী'কে বলিলেন–"তোমাদের ইবাদত সাহাবাগণের ইবাদত অপেক্ষা পরিমাণে অধিক। কিন্তু তাঁহারা তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কারণ, পার্থিব বিষয়ে তাঁহারা তোমাদের অপেক্ষা অধিক সংসার বিরাগী ছিলেন।" হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন–"সংসার-বিরাগই দুনিয়াতে মনের শান্তি এবং দেহের সুখ।" হযরত

ইবনে মাস্‌উদ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন–"সংসার-বিরাগীর দুই রাকাত নামায সমস্ত মুজতাহিদের সমগ্র জীবনের ইবাদত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" হযরত সহল তস্তরী (রা) বলেন–"তুমি খাদ্যের অভাব, বস্ত্রের অভাব, দরিদ্রতা এবং অপমান এই চারিটি পদার্থের ভয় হইতে নির্মুক্ত হইতে পারিলে কেবল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে বিশুদ্ধ সংকল্পে কাজ করিতে পারিবে।"

যুহ্‌দের শ্রেণীবিভাগ– সংসার-বিরাগীর প্রকারভেদে যুহ্‌দ (বৈরাগ্য) তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। (১) যাহারা দুনিয়া হইতে হস্ত সঙ্কুচিত করিয়া লইয়াছে, কিন্তু হৃদয়কে সংসারের প্রতি অনাসক্ত করিতে পারে নাই অথচ পূর্ণভাবে সংসার-বিরাগী হওয়ার জন্য ধৈর্যের সহিত কঠোর সাধনা করিয়া যাইতেছে। তাহাদিগকে মুতাযাহ্‌হিদ (বৈরাগ্য-শিক্ষার্থী) বলে, যাহিদ (সংসারবিরাগী) বলে না। তবে এই স্থান হইতেই যাহেদির যাত্রা শুরু হয়। (২) যাহারা হস্ত ও হৃদয় উভয়ই সংসার হইতে তুলিয়া লইতে পারিতেছে, কিন্তু নিজের সংসার-বিরাগের ভাব তাহাদের অন্তরে জাগরূক থাকে এবং সংসার-বিরোগী হইয়া তাহারা অতি বড় কাজ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করে। এই শ্রেণীর লোক যাহিদ বটে, কিন্তু দোষমুক্ত নহে। (৩) যাহারা নিজের যুহ্‌দের বিষয়ও ভুলিয়া যায়, অর্থাৎ তাহারা যে যাহিদ এ কথা তাহাদের কল্পনায়ও আসে না এবং সংসার-বিরাগী হইয়া তাহারা অতি বড় কাজ করিয়াছে বলিয়াও মনে করে না। এই শ্রেণীর যাহিদের উদাহরণ এইরূপ–মনে কর, এক ব্যক্তি বাদশাহ্‌র মন্ত্রিত্ব পদ লাভের আশায় রাজ প্রাসাদের সিংহদ্বারে উপস্থিত হইল। কিন্তু তথায় অবস্থিত এক কুকুর তাহাকে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিতে বাধা দিল। তখন সেই ব্যক্তি হস্তস্থিত রুটি কুকুরের সম্মুখে ফেলিয়া দিল। কুকুর খাদ্য পাইয়া দ্বার ছাড়িয়া দিল এবং সেই ব্যক্তি বাদশাহ্‌র দরবারে যাইয়া মন্ত্রিত্বের পদে অধিষ্ঠিত হইল।

সংসারের সমস্ত ভোগ্যবস্তু এক টুকরা রুটিতুল্য এবং শয়তান কুকুরের ন্যায় আল্লাহ্‌র দরবারে গমনোন্মুখ ব্যক্তিগণকে বাধা প্রদান করিতেছে। রুটির ন্যায় সংসারের ভোগ্যবস্তু শয়তানরূপ কুকুরের সম্মুখে ফেলিয়া দিলে সে তোমার পথ ছাড়িয়া দিবে। মন্ত্রিত্ব পদের তুলনায় এক টুকরা রুটি যেমন তুচ্ছ আখিরাতের তুলনায় সমস্ত জগৎ ততোধিক তুচ্ছ। কারণ, দুনিয়া সসীম এবং আখিরাত অসীম। অসীমের সহিত সসীমের কোন তুলনাই হইতে পারে না। এইজন্যই হযরত আবূ ইয়াযীদ বুস্তামীর (র) নিকট যখন লোকে বলিল যে, অমুক ব্যক্তি বৈরাগ্যের উপদেশ দিতেছেন, তখন তিনি বলিলেন–"কোন্ বিষয় হইতে

বৈরাগ্য?" তাহারা বলিল–"সংসার হইতে বৈরাগ্য।" তিনি বলিলেন–"সংসার ত কোন পদার্থই নহে। ইহার প্রতি আবার অনাসক্ত হওয়ার অর্থ কি? একমাত্র উপযুক্ত বস্তুর প্রতিই অনাসক্তি হইতে পারে।

অভিলষিত বস্তুর প্রকারভেদে বৈরাগ্য তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা–(১) পরকালের আযাব হইতে মুক্তি পাইবার আশায় সংসার-বিরাগী হওয়া এবং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকা। ইহা আল্লাহ-ভীরু লোকদের বৈরাগ্য। একদা হযরত মালিক দীনার (র) বলেন–"গত রজনীতে আমি বড় ধৃষ্টতা করিয়াছি যে, আমি আল্লাহ্‌র নিকট বেহেশ্‌ত চাহিয়াছি।" (২) পরকালের পুরস্কারের আশায় সংসার-বিরাগী হওয়া। ইহা সংসারের প্রতি পূর্ণ অনাসক্তি। কেননা আখিরাতের আশা ও আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসা হইতেই সংসারের প্রতি অনাসক্তির উদ্ভব হয়। তবে ইহা হইল আশাধারী লোকদের যুহ্‌দ। (৩) এই শ্রেণীর সংসার-বিরাগীর অন্তরে দোযখের ভয় বা বেহেশ্‌তের আশা, কোন কিছুই থাকে না। কেবল আল্লাহ্‌র মহব্বত তাঁহাদের অন্তরকে দুনিয়া ও আখিরাতের প্রতি একেবারে উদাসীন করিয়া রাখে। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন পদার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করাকেও তাঁহারা অন্যায় ও অপমানজনক বলিয়া মনে করেন। ইহাই সর্বোচ্চ শ্রেণীর যুহ্‌দ। যেমন হযরত রাবেয়ার (র) নিকট লোকে বেহেশ্‌তের উল্লেখ করিলে তিনি বলিলেন– اَلْجَارُ ثُمَّ الدَّارُ – অর্থাৎ "গৃহ অপেক্ষা গৃহস্বামী উৎকৃষ্ট।" বাদশাহীর আনন্দের তুলনায় শিশুদের পক্ষী-ক্রীড়াজনিত আনন্দ যেমন অকিঞ্চিৎকর, আল্লাহ্‌র মহব্বতের আনন্দের তুলনায় বেহেশ্‌তের আনন্দও আল্লাহ্-প্রেমিকের নিকট তদ্রূপ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া অনুভূত হয়। কিন্তু শিশু বাদশাহী অপেক্ষা পক্ষী-ক্রীড়াকেই অধিক ভালবাসে। ইহার কারণ এই যে, শিশুর বুদ্ধি বিকাশপ্রাপ্ত হয় নাই বলিয়া সে বাদ্‌শাহীর আনন্দ বুঝিতে পারে না। তদ্রূপ আল্লাহ্‌র দর্শন ব্যতীত যাহারা অপর কিছু পাওয়ার কামনা করে বুঝিতে হইবে, তাহারাও এমন শিশুর ন্যায় অপরিপক্ক বুদ্ধিসম্পন্ন, যে তাহার বুদ্ধি বিকশিত না হওয়ার দরুন বাদ্‌শাহীর আনন্দ বুঝিতে অক্ষম।

পরিত্যক্ত বস্তুর প্রকারভেদেও যুহ্‌দের বহু শ্রেণী আছে। কারণ, কেহ হয়ত দুনিয়া একেবারে পরিত্যাগ না করিয়া ইহার কিয়দংশ পরিত্যাগ করে। কিন্তু যে পদার্থে প্রবৃত্তি আনন্দ পায়, অথচ ধর্মপথে ইহার কোন আবশ্যকতা নাই, এই প্রকার সকল পদার্থ পরিত্যাগ করাকেই সর্বোচ্চ শ্রেণীর যুহ্‌দ বলে। কেননা ধন,

মান, পানাহার, পরিচ্ছদ, বাক্যালাপ নিদ্রা, সংসর্গ, শিক্ষাদান, উপদেশ প্রদান, হাদীস-বর্ণনা ইত্যাদিতে প্রবৃত্তি যে-আনন্দ পায় ইহার নামই দুনিয়া এবং প্রবৃত্তি যে সম্মান বোধ করে, ইহাও দুনিয়ারই অন্তর্গত। কিন্তু একমাত্র মানুষের হেদায়েতের জন্য যদি শিক্ষাদান, হাদীস বর্ণনা ও উপদেশ প্রদান করা হয় এবং মানবজাতিকে পাপ হইতে বিরত রাখিয়া আল্লাহ্‌র দিকে আকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্য থাকে, তবে এই সমস্ত কাজ দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত নহে।

হযরত আবূ সুলায়মান দারানী (র) বলেন–"যুহ্‌দ সম্বন্ধে আমি অনেকের উক্তি শ্রবণ করিয়াছি। কিন্তু আমার অভিমত এই যে, যে-বস্তু মানুষকে আল্লাহ্ হইতে দূরে রাখে, তাহা পরিত্যাগ করাই প্রকৃত যুহ্‌দ। তিনি অন্যত্র বলেন–"যে ব্যক্তি বিবাহ, ভ্রমণ এবং হাদীস শরীফ লেখার কার্যে লিপ্ত আছে, সেই ব্যক্তিও দুনিয়ার প্রতি নিবিষ্ট।" লোকে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল– اِلاَّ مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ – (তবে হাঁ, যে-ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট কল্‌বে সালীম' অর্থাৎ নির্মল হৃদয় উপস্থিত করিবে।) এই আয়াতে 'কল্‌মে সালীম' এর অর্থ কি?" তিনি বলিলেন–"যে হৃদয়ে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর চিন্তা স্থান পায় না তাহাই কল্‌বে সালীম।"

হযরত যাকারিয়া আলায়হিস্ সালামের পুত্র হযরত ইয়াহ্‌ইয়া আলায়হিস্ সালাম চট পরিধান করিতেন। কোমল বস্ত্র পরিধান করিলে তাঁহার দেহ আরাম পাইবে, প্রবৃত্তি আনন্দ লাভ করিবে, এই ভয়ে তিনি চট পরিধান করিতেন। পরিহিত চটের ঘর্ষণে তাঁহার শরীরে ক্ষত হইয়া গিয়ছিল। তাঁহার মাতা স্নেহ-পরবশ হইয়া তাঁহাকে পশমী বস্তু পরিধান করিতে বাধ্য করিলেন। তিনি পশমী বস্ত্র পরিধান করিলে ওহী অবতীর্ণ হইল–"হে ইয়াহ্‌ইয়া, তুমি আমাকে ছাড়িয়া দুনিয়া গ্রহণ করিলে।" ইহা শুনিয়া তিনি খুব রোদন করিলেন এবং পুনরায় চট পরিধান করিলেন। ইহা অতিউচ্চ শ্রেণীর যুহ্‌দ এবং যে-সে ব্যক্তি এই উন্নত অবস্থা লাভ করিতে পারে না। বরং পরিত্যক্ত বস্তুর আনন্দের তারতম্যানুসারে যুহ্‌দের শ্রেণী নির্ধারিত হয় অর্থাৎ যে-পরিমাণ আনন্দপ্রদ বস্তু পরিত্যাগ করা হয়, যুহ্‌দও সেই পরিমাণে উন্নত শ্রেণীর বলিয়া পরিগণিত হয়।

একসঙ্গে সকল পাপ হইতে তওবা করা অসম্ভব হইলে যেমন কোন কোন পাপ হইতে তওবা করা জায়েয, তদ্রূপ প্রবৃত্তির আনন্দপ্রদ কোন কোন বস্তু হইতেও যুহ্‌দ অবলম্বন করা জায়েয আছে। ইহার অর্থ এই যে, আংশিক যুহ্‌দ

নিষ্ফল এবং নিরর্থক নহে; ইহার সওয়াব পাওয়া যাইবে। কিন্তু সংসার-বিরাগী ও তওবাকারীর জন্য পরকালে উচ্চ মর্যাদা দানের যে অঙ্গীকার আছে, তাহা কেবল সকল লোভনীয় পদার্থ পরিত্যাগকারী সংসার-বিরাগী ও সমস্ত পাপ হইতে তওবাকারী ব্যক্তির জন্য অবধারিত।

সংসার-বিরাগীর পরিতুষ্টির জন্য অবশ্যক বস্তু–মানবজাতি সংসাররূপ কারাগারে বন্দী হইয়া রহিয়াছে এবং ইহার বিপদাপদের অন্ত নাই। দুনিয়াতে ছয় প্রকার বস্তু মানবের জন্য নিতান্ত আবশ্যক। যথা–(১) অন্ন, (২), বস্ত্র, (৩) গৃহ, (৪) গৃহ-সামগ্রী, (৫) পত্নী এবং (৬) ধন ও মান।

আহার্যদ্রব্যের পরিমাণ ও শ্রেণীভেদ–মানবের জন্য প্রথম আবশ্যক আহার্যদ্রব্য; উহা নানাবিধ। যাহা আহার করিলে কেবল শরীর রক্ষা পায়, তাহাই নিকৃষ্ট শ্রেণীর খাদ্যদ্রব্য; যেমন খুদকুড়া, ভূষি ইত্যাদি ভক্ষণ করিলেও শরীর রক্ষা পাইতে পারে। যব, বাজরা মধ্যম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং চালা-আটার রুটি প্রথম শেণীর খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে পরিগণিত। যে-ব্যক্তি চালা-আটার রুটি ভক্ষণ করে, সে যুহ্‌দের গণ্ডির বাহিরে চলিয়া যায় এবং তখন সে শরীর-সেবক হইয়া পড়ে। পরিমাণ হিসাবেও আহারের শ্রেণীভেদ আছে। আহারের নিম্ন পরিমাণ দৈনিক প্রায় তিন ছটাক, মধ্যম পরিমাণ দৈহিক প্রায় চারি ছটাক এবং সর্বোচ্চ পরিমাণ দৈহিক প্রায় অর্ধসের। ধর্মপথ-যাত্রীর জন্য শরীয়তে খাদ্যের পরিমাণও নির্ধারিত আছে। ইহার অতিরিক্ত ভক্ষণ করিলে আহার বিষয়ে যুহ্‌দ রক্ষা পায় না।

ভবিষ্যতের জন্য আহার্যদ্রব্য সঞ্চয় করিয়া রাখারও পরিমাণ নির্ধারিত রহিয়াছে। ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়া কেবল এক বেলার আহার চলিবার উপযোগী খাদ্যদ্রব্য সঞ্চিত রাখা সর্বোচ্চ শ্রেণী যুহ্‌দের নিদর্শন। কারণ লঘু আশা যুহ্‌দের মূল এবং দীর্ঘ আশা লোভের আকর। এক মাস বা চল্লিশ দিনের আহার্য সামগ্রী হাতে রাখা মধ্যম শেণীর যুহ্‌দ। এক বৎসরের উপযোগী খাদ্যদ্রব্য রাখা নিকৃষ্ট শ্রেণীর যুহ্‌দের কার্য। এক বৎসরের অধিক কাল চলার উপযোগী খাদ্যদ্রব্য হাতে রাখিলে যুহ্‌দ হইতে বঞ্চিত হয়। কারণ সেই ব্যক্তি যুহদের সীমা ছাড়াইয়া যায়। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম স্বীয় পরিবারবর্গের জন্য এক বৎসরের খাদ্যদ্রব্য রাখিতেন; কেননা তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত ক্ষুধা জ্বালা সহ্য করিতে পরিতেন না। কিন্তু তিনি নিজের জন্য রাত্রির খাদ্যও দিবসে সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন না।

শাক ও শির্কা নিকৃষ্ট শ্রেণীর ব্যঞ্জন। যায়তুন-তৈল ও যায়তুন-তৈল নির্মিত দ্রব্যাদি মধ্যম শ্রেণীর ব্যঞ্জনের অন্তর্গত এবং গোশ্‌ত সর্বোচ্চ শ্রেণীর ব্যঞ্জনের মধ্যে গণ্য। সর্বদা গোশ্‌ত ভক্ষণ করিলে যুহ্‌দ সমূলে বিনষ্ট হয়; কিন্তু সপ্তাহে দুই একবার ভক্ষণ করিলে একেবারে নষ্ট হয় না। পরিশেষে আহারের সময়ের প্রতিও লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। দিবারাত্রের মধ্যে একবারের অধিক আহার করা উচিত নহে। দুই দিনে একবার আহার করা পূর্ণ যুহ্‌দের পরিচয়। প্রত্যহ দুইবার ভক্ষণ করিলে যুহ্‌দ থাকে না।

যুহ্‌দ সম্বন্ধে জানিতে চাহিলে রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবাগণের (রা) জীবন-চরিত্র পাঠ করা উচিত। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা বলেন–"কখন কখন এমন হইত যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের গৃহে চল্লিশ দিন পর্যন্ত প্রদীপ জ্বলিত না এবং খোরমা ও পানি ব্যতীত অন্য কোন খাদ্যদ্রব্য থাকিত না।" হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম বলেন–"যে ব্যক্তি বেহেশ্‌ত পাইতে চায়, সে যেন যবের রুটি আহার করিয়া কুকুরের সহিত আবর্জনার স্তূপে শয়ন করে।" তিনি তাঁহার সহচরগণকে লক্ষ্য করিয়া বলেন–"যবের রুচি ও শাক ভক্ষণ কর। গমের অনুসন্ধান করিও না; কেননা, ইহার কৃতজ্ঞতা তোমরা প্রকাশ করিতে পারিবে না।"

বস্ত্রের পরিমাণ ও প্রকারভেদ–দ্বিতীয় প্রকার প্রয়োজনীয় পদার্থ হইল বস্ত্র। সংসার-বিরাগী লোকের পক্ষে একাধিক বস্ত্র রাখা উচিত নহে; এমন কি বিবস্ত্র হইয়া পরিহিত বস্ত্র ধৌত করিতে হইবে। যাহার নিকট দুইটি বস্ত্র থাকে, সে সংসার-বিরাগী নহে। পরিচ্ছদের নিম্নতম পরিমাণ হইল একটি লম্বা জামা, একটি টুপী এবং এক জোড়া জুতা। তদুপরি পাগড়ী ও একটি লুঙ্গি হইলে পরিচ্ছদের সর্বাধিক পরিমাণ হইয়া পড়ে। চট নিকৃষ্ট শ্রেণীর পরিচ্ছেদ; মোটা পশমী বস্ত্র মধ্যম শ্রেণীর এবং তুলার মোটা বস্ত্র সর্বোৎকৃষ্ট শ্রেণীর পরিচ্ছদের মধ্যে গণ্য। যে-ব্যক্তি সূক্ষ্ম ও কোমল বস্ত্র পরিধান করে সে সংসার-বিরাগী নহে।

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা একখানা কম্বল ও একখানা মোটা লুঙ্গি বাহির করিয়া আনিয়া বলিলেন–"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সালামের এই পর্যন্তই পরিচ্ছদ ছিল।" হাদীস শরীফে আছে, যে-পোশাক পরিধান করিলে

খ্যাতি বৃদ্ধি পায়, তাহা আল্লাহ্‌র কোন প্রিয়পাত্র পরিধান করিলেও উহা যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার পরিধানে থাকিবে ততক্ষণ আল্লাহ্ তৎপ্রতি ক্রুদ্ধ থাকিবে। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দুইখানা বস্ত্র অর্থাৎ কম্বল ও লুঙ্গির মূল্য দশ দেরহামের (১) অধিক হইত না। একবার তাহার নিকট উপঢৌকনস্বরূপ একখানা বস্ত্র আসিল। ইহাতে কয়েকটি বুটা ছিল। হযরত (সা) বস্ত্রখানা পরিধান করিয়াই উন্মোচন করিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন–"ইহা আবূ জহীসের নিকট লইয়া যাও এবং তাহার কম্বল লইয়া আস; কেননা উহার বুটাসমূহ আমার দৃষ্টিকে নিজের দিকে নিবদ্ধ করিয়াছে।" একবার হযরতের (সা) পবিত্র পাদুকায় নূতন ফিতা লাগানো হইয়াছিল। কিছুক্ষণ পর তিনি বলিলেন–"ঐ পুরাতন ফিতা লাগাইয়া দাও। কারণ, ইহা আমি পছন্দ করি না; নামাযের সময় ইহার প্রতি আমার দৃষ্টি পতিত হইয়াছিল।" একবার মিম্বরের উপর দণ্ডায়মান হইয়া উপদেশ প্রদানকালে রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম স্বীয় অঙ্গুলি হইতে আংটি খুলিয়া লইলেন। কারণ, তাঁহার দৃষ্টি আংটির দিকে পতিত হইয়াছিল। তৎপর তিনি বলিলেন–"এক দৃষ্টি ইহার উপর পড়িবে, আর এক দৃষ্টি তোমাদের উপর পড়িবে, ইহা সম্ভব নহে।" একবার হযরতের (সা) জন্য এক জোড়া নুতন পাদুকা আনয়ন করা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ সিজদায় প্রণত হইলেন। কিছুক্ষণ পর সিজদা হইতে উঠিয়া তিনি বাহিরে তশরীফ নিলেন। সর্বপ্রথমে তাঁহার সহিত যে-দরিদ্র ব্যক্তির সাক্ষাৎ ঘটিল, তিনি তাহাকে পাদুকা জোড়াখানা দান করিলেন এবং বলিলেন–"আমার চক্ষে ইহা সুন্দর লাগিয়াছিল। আল্লাহ্ আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া পড়েন কিনা, আমার এই আশঙ্কা হইয়াছিল। এইজন্য আমি সিজদা করিলাম।" তিনি হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হাকে সম্বোধন করিয়া বলেন–"কিয়ামতের দিন আমার সহিত মিলিত হইতে চাহিলে দুনিয়াতে জীবনধারণ-উপযোগী বস্তুতে পরিতুষ্ট থাক এবং তালি দেওয়ার পূর্বে পরিধেয় জামা দেহ হইতে খুলিয়া ফেলিয়া দিও না।

একদা গণনা করিয়া দেখা হইয়াছিল যে, হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর পরিহিত বস্ত্রে চৌদ্দটি তালি লাগানো হইয়াছে। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু খলীফা পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন তিন দেরহাম মূল্যে একটি জামা খরিদ করিলেন। ইহার আস্তিন লম্বা হওয়াতে অতিরিক্ত অংশ ছিড়িয়া ফিলিয়া দিয়া

(১) প্রতি দেরহামের মূল্য ঐ সময়ে ছিল প্রায় ৮ টাকার সমান

তিনি বলিলেন–" আল্লাহ্ তা'আলাকে ধন্যবাদ, যিনি আমাকে অনুগ্রহপূর্বক এই পোশাক পরিধান করিতে দিয়াছেন।" এক বুযুর্গ বলেন "আমি হযরত সুফিয়ান সাওরীর (র) পাদুকাসহ পরিচ্ছদের মূল্য যাচাই করিয়া দেখিলাম যে, ইহা এক দেরহাম চারি দাঙ্গের অধিক হয় নাই।" হাদীস শরীফে উক্ত হইয়াছে, যাহার বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করিবার অর্থবল আছে, সেই ব্যক্তি যদি বিনয় অবলম্বনপূর্বক তদ্রূপ পরিচ্ছদ পরিধান না করে, তবে সে আল্লাহ্‌র নিকট হইতে পদ্মরাগ মণি নির্মিত বৃহৎ থালাসমূহ পরিপূর্ণ বেহেশতী পোশাক পাওয়ার অধিকার লাভ করে। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন, যে-সকল মহামানবকে মানবজাতির হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে, তাঁহাদের নিকট হইতে আল্লাহ্ তা'আলা অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের পোশাক যেন সাধারণ লোকের পোশাকের ন্যায় হয়। তাহা হইলে ধনবান লোক তাঁহাদের অনুসরণ করিবে এবং দরিদ্রগণ মনঃক্ষুণ্ন হইবে না।

হযরত ফাযালা ইব্‌নে ওবায়দুল্লাহ্ (র) মিসরের শাসনকর্তা ছিলেন। লোকে তাঁকে সামান্য পোশাক পরিধানপূর্বক নগ্নপদে চলিতে দেখিয়া বলিল–"আপনি এইরূপ সাধারণ বেশে চলাফেরা করিবেন না। কারণ, আপনি এই দেশের শাসনকর্তা।" তিনি উত্তর দিলেন–" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমাদিগকে আড়ম্বর প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কখন কখন নগ্নপদে চলিবার জন্য তিনি আমাদিগকে আদেশ দিয়াছেন।" হযরত মুহাম্মদ ইব্‌নে ওয়াসে (র) একদা মোটা পশমের সামান্য বস্ত্র পরিধানপূর্বক কুতায়বা ইব্‌নে মুস্‌লিমের নিকট গেলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন–"তুমি এমন পশমী বস্ত্র পরিধান করিয়াছ কেন?" হযরত মুহাম্মদ ইব্‌নে ওয়াসে' (র) উত্তর না দিয়া নীরব থাকিলে তিনি নীরবতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে তিনি বলিলেন–"আমি কি উত্তর দিব? যদি বলি যে, যুহ্‌দ অবলম্বন করিয়াছি তবে আত্মপ্রশংসা হয়; আর যদি বলি যে, দরিদ্রতার কারণে এইরূপ নিকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান করিয়াছি, তবে আল্লাহ্‌র বিধানের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়।" লোকে হযরত সালমানকে (রা) জিজ্ঞাসা করিল–"আপনি উৎকৃষ্ট পোশাক পরিধান করেন না কেন?" তিনি বলিলেন– "দাস হইয়া কিরূপে উৎকৃষ্ট পোশাক পরিধান করা যায়? আগামী কল্য (অর্থাৎ আখিরাতে) স্বাধীন হইতে পারিলে উৎকৃষ্ট পোশাক পরিধানে বঞ্চিত থাকিব না।" হযরত ওমর ইব্‌নে আবদুল

আযীযের (রা) একখানা চট ছিল। ইহা পরিধান করিয়া তিনি রাত্রে নামায পড়িতেন। লোকে দেখিবে বলিয়া দিবসে তিনি ইহা পরিধান করিতেন না। হযরত হাসান বস্‌রী (র) ফরকদ সঞ্জীকে বলিলেন–"এই কম্বল পরিধানপূর্বক তুমি হয়ত নিজকে অপর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মনে করিতেছ। আমি ত শুনিয়াছি যে, অধিকাংশ কম্বল পরিধানকারী দোযখে যাইবে।"

গৃহের প্রকার ও ব্যবহার –তৃতীয় প্রকার দরকারী বস্তু বাসগৃহ। ইহার নিম্নতম শ্রেণী হইল বাসের জন্য কোন স্থান নির্দিষ্ট না করিয়া কোন মসজিদে বা কোন পান্থশালার এক কোণে আশ্রয় পাইলেই পরিতুষ্ট হইয়া থাকা। আবাস-স্থানের সর্বোচ্চ শ্রেণী হইল নিজ-নির্মিত বা ভাড়ায় কোন গৃহ আপন অধিকারে রাখা। এইরূপ বাসগৃহের আয়তন আবশ্যকতা অনুযায়ী হওয়া উচিত; অনাবশ্যক প্রশস্ত বা উচ্চ হওয়া উচিত নহে এবং ইহাতে নানারূপ চিত্রবিচিত্র কারুকার্যও থাকিতে পারিবে না। এইরূপ আড়ম্বরশূন্য গৃহও আবার ছয় হাতের অধিক উচ্চ হইলে অধিবাসী যুহ্‌দের সীমা হইতে বহির্গত হইয়া পড়িবে। শীতাতপ হইতে আত্মরক্ষার জন্য গৃহের আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত ইহাতে জাঁকজমক ও ঐশ্বর্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্য থাকা উচিত নহে।

বুযুর্গগণ বলেন, রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর মানবসমাজে দীর্ঘ আশার বিস্তার সর্বপ্রথমে এইরূপে হইল যে, লোকে চুনকাম-করা গৃহ ও অধিক সেলাইযুক্ত সুন্দর সুন্দর পোশাক তৈয়ার করিতে আরম্ভ করিল এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লামের সময়ে কেবল এক সেলাই দিয়া পরিধেয় বস্ত্র তৈয়ার করা হইত, একের অধিক সেলাই দেওয়া হইত না। হযরত আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু এক উচ্চ গৃহ নির্মাণ করিয়াছিলেন। তৎপর হযরতের (সা) আদেশে ইহা ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম একদা কোন স্থানে যাওয়ার কালে একটি উচ্চ গুম্বজওয়ালা গৃহ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন–"গৃহটি কাহার?" লোকে তাঁহাকে গৃহস্বামীর নাম জানাইল। তৎপর সেই ব্যক্তি হযরতের (সা) নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাহার প্রতি দৃষ্টিপাতও করেন নাই। লোকের নিকট হইতে হযরতের (সা) অসন্তোষের কারণ জিজ্ঞাসাপূর্বক অবগত হইয়া সেই ব্যক্তি গৃহের গুম্বজটি ভাঙ্গিয়া ফেলিল। ইহার পর হযরত (সা) তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহার মঙ্গলের জন্য দু'আ করিলেন। হযরত হাসান (রা) বলেন–"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সালাম সারা জীবনে কখনও ইটের উপর

ইট রাখেন নাই এবং কাঠের সহিত কাঠ জোড়া দেন নাই।" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"আল্লাহ্ যাহার অমঙ্গল চাহেন তাহার ধন পানি এবং মাটিতে নষ্ট করিয়া দেন।" (অর্থাৎ এরূপ ব্যক্তি পাকা বাড়ী বানাইয়া টাকা-পয়সা অযথা নষ্ট করে।)

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন–"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট আগমনপূর্বক আমরা কি করি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি নিবেদন করিলাম–'নলের ঘরখানি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। ইহা মেরামত করিতেছি।" হযরত (সা) বলিলেন–'অবসর কোথায়, ব্যাপার ত সন্নিকট।" অর্থাৎ মৃত্যু অতি নিকটবর্তী।) রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"যে-ব্যক্তি অনাবশ্যক গৃহ নির্মাণ করিবে, কিয়ামতের দিন তাহাকে এই গৃহ মাথায় উঠাইয়া লইবার আদেশ করা হইবে।" তিনি বলেন–(অভাব মোচনের জন্য) "মানুষ যাহা ব্যয় করে, তাহার পুণ্য সে পাইবে। কিন্তু মাটি ও পানিতে সে যাহা ব্যয় করে তাহার পুণ্য সে পাইবে না।" হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম নলের গৃহ বানাইলেন। লোকে জিজ্ঞাসা করিল–"আপনি ইটের ঘর বানাইলে কি দোষ হইত।? তিনি বলিলেন–"যাহাকে মরিতে হইবে, তাহার জন্য ইহাও অতিরিক্ত।" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"যে ব্যক্তি (দুনিয়াতে) বড় বড় গৃহ তৈয়ার করে, কিয়ামতের দিন ইহা তাহার জন্য বিপদ হইবে। কিন্তু শীতাতপ হইতে রক্ষা পাওয়া জন্য যে-গৃহ আবশ্যক, ইহা তাহার জন্য বিপদ হইবে না।"

সিরিয়া দেশে যাইবার পথে মযবুত ইষ্টক নির্মিত একটি উচ্চ প্রাসাদ দেখিয়া হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলিলেন–"আমি জানিতাম না যে, এই উম্মতের মধ্যে কেহ এমন প্রাসাদ নির্মাণ করিবে। এই প্রকার প্রাসাদ হামান ফেরআউনের জন্য বানাইয়াছিল। কারণ, ফেরআউন পাকা ইট তৈয়ার করিতে আদেশ দিয়া বলিয়াছিল – أَوْقِدْ لِيْ يَا هَامَانُ عَلَى الطِّيْنِ "হে হামান, আমার জন্য মাটির উপর আগুন জ্বালাও।" (অর্থাৎ পাকা ইট তৈয়ার কর) সূরা কাসাস, ৪ রুকূ, ২০ পারা।) হাদীস শরীফে আছে যে, বান্দা যখন ছয় হাত অপেক্ষা উচ্চ গৃহ তৈয়ার করে তখন ফিরিশতা আকাশ হইতে ঘোষণা করে–"রে ফাসিক শ্রেষ্ঠ! তুই কোথায় আসিতেছিস্?" অর্থাৎ তোকে ভূগর্ভে যাওয়া উচিত ছিল। তুই আকাশে উঠিতেছিস কেন? হযরত হাসান রাযিয়াল্লাহু

আন্হু বলেন–"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সকল গৃহ এরূপ উচ্চ ছিল যে, একজন লোক দাঁড়াইয়া হাত বাড়াইলে গৃহের ছাদে হাত লাগিল। হযরত ফুযায়েল (র) বলিতেন–"লোকে গৃহ নির্মাণপূর্বক ইহা পরিত্যাগ করিয়া মরিয়া যায় দেখিয়া আমি আশ্চর্য বোধ করি না। কিন্তু আশ্চর্য বোধ করি ইহা দেখিয়া যে লোকে উপদেশ গ্রহণ করে না।"

গৃহসামগ্রীর পরিমাণ– চতুর্থ প্রকার আবশ্যক দ্রব্য হইল গৃহসামগ্রী। এ-সম্বন্ধে হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামের আদর্শ সর্বোৎকৃষ্ট। প্রথমে তাঁহার একটি চিরুনি ও একটি পেয়ালা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। একদা এক ব্যক্তিকে অঙ্গুলি দ্বারা দাড়ি আঁচড়াইতে দেখিয়া তিনি চিরুনি পরিত্যাগ করিলেন। আবার এক ব্যক্তিকে অঞ্জলি করিয়া পানি পান করিতে দেখিয়া তিনি পেয়ালাটিও বর্জন করিলেন। গৃহসামগ্রীর মধ্যম শ্রেণী হইল প্রত্যেক দরকারী বস্তুর এক একটি করিয়া রাখা। উহা মাটি বা কাঠের নির্মিত হওয়া আবশ্যক। তামা বা পিতলের তৈজসপত্র ব্যবহার করিলে যুহ্দ বিনষ্ট হয়। পূর্বকালের বুযুর্গগণ একই দ্রব্য বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করিবার চেষ্টা করিতেন।

রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্লামের গাছের ছালে ভর্তি করা একখানা বালিশ ছিল এবং একটি কম্বল দুই ভাঁজ করিয়া পাতিয়া তাঁহার শয্যা তৈয়ার করা হইত। একদা হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্হু তাঁহার পবিত্র পাঁজরে খেজুর পাতার চাটাইর দাগ দেখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। হযরত (সা) রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন–"হে আল্লাহ্র রাসূল, দুনিয়ার বাদ্শাহগণ আল্লাহ্র দুশমন হইয়াও সুখভোগ করিতেছে এবং আল্লাহর রাসূল ও প্রিয় বন্ধু এত দুঃখকষ্ট সহ্য করিতেছেন দেখিয়া আমি রোদন করিতেছি।" হযরত (সা) বলিলেন–"হে ওমর, আল্লাহ্ যে তাহাদিগকে পার্থিব ধন দান করিয়াছেন এবং আমাদের জন্য পরকালের অনন্ত সম্পদ অবধারিত করিয়া রাখিয়াছেন, ইহাতে কি তুমি সন্তুষ্ট হইবে না?" হযরত ওমর (রা) বলিলেন–"আমি সন্তুষ্ট হইলাম।" তৎপর হযরত (সা) বলিলেন–"হে ওমর, অবগত হও আমি যাহা বলিলাম, তাহাই প্রকৃত ব্যাপার।" এক ব্যক্তি হযরত আবূ যর রাযিয়াল্লাহু আন্হুর গৃহে যাইয়া দেখিল সমস্ত গৃহে কিছুই নাই। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন–"হে আবূ যর, তোমার গৃহে তো কিছুই নাই!" হযরত আবূ যর (রা) বলিলেন–"আমার হাতে যাহা কিছু আছে, আমি তাহা আমার অন্যগৃহে পাঠাইয়া দেই।" (অন্যগৃহ' অর্থে তিনি পরকালকে বুঝাইয়াছেন।) সেই ব্যক্তি

বলিলেন–"এ-গৃহে যতক্ষণ পর্যন্ত আছ ততক্ষণ ত কিছু গৃহসামগ্রী আবশ্যক।" হযরত আবূ যর (রা) বলিলেন–"গৃহস্বামী (অর্থাৎ আল্লাহ্) আমাকে এখানে থাকিতে দিবেন না।"

হাম্সের শাসনকর্তা হযরত আমীর ইব্নে সা'আদ হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্হুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন–"পার্থিব আসবাবপত্রের মধ্যে তোমার নিকট কি কি আছে?" তিনি বলিলেন– "একটি লাঠি; ইহাতে ভর করিয়া পথ চলি এবং ইহা দ্বারা সাপ মারিয়া থাকি। একটি থলি, ইহাতে খাদ্যদ্রব্য রাখি একটি পেয়ালা ইহাতে আহার করি এবং ইহাতে পানি রাখিয়া মস্তক ও বস্ত্রাদি ধৌত করি। একটি লোটা, ইহাতে পানি পান করি এবং ওযু করি। এইগুলি মূলবস্তু তৎসমূদয় ব্যতীত যাহা আছে তাহা উহার আনুষঙ্গিক।" এক সফর হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আন্হার গৃহে গমন করিলেন। গৃহের দ্বারে একখানা পর্দা ঝুলিতেছিল এবং কন্যার হস্তে তিনি রূপার বালা দেখিতে পাইলেন। ইহা দর্শনে অসন্তুষ্ট হইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ ফিলিয়া গেলেন। হযরত ফাতিমা (রা) বুঝিতে পারিলেন যে, গৃহদ্বারে পর্দা ও হস্তের বালা দেখিয়া অসন্তুষ্ট হইয়া তিনি চলিয়া গিয়াছেন। হযরত ফাতিমা (রা) কালবিলম্ব না করিয়া পর্দা ও বালা বিক্রয় করত উহা মূল্য গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া হযরত (সা) হযরত ফাতিমার (রা) প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন–"তুমি অতি উত্তম কাজ করিয়াছ।" হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্হার গৃহে একটি পর্দা ছিল। হযরত (সা) হযরত আয়েশাকে (রা) লক্ষ্য করিয়া বলিলেন–"এই পর্দা দেখিলে দুনিয়া আমার স্মরণে আসে। ইহা লইয়া যাইয়া অমুককে দিয়া আস।"

পরিধানের কম্বল দুই ভাঁজ করিয়া ইহার উপর রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম রাত্রে শয়ন করিতেন। এক রজনীতে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্হা একখানা নূতন বিছানা পাতিয়া দিলেন। হযরত (সা) ইহাতে শয়ন করিয়া সমস্ত রজনী অনিদ্রায় ও অশান্তিতে কাটাইলেন এবং পর দিবস বলিলেন–"এই বিছানা আমার নিদ্রা নষ্ট করিয়াছে।" তদবধি হযরত আয়েশা (রা) তাঁহাকে ঐ কম্বলটি বিছাইয়া দিতেন। একবার রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট কিছু ধন আসিল। তিনি সব ধন দরিদ্রের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন; তন্মধ্য হইতে মাত্র ছয়টি দীনার অবশিষ্ট রহিল। এই

অর্থ জমা থাকার দরুন সমস্ত রজনী তিনি ঘুমাইতে পারেন নাই। শেষ রাত্রে তিনি ঐ ছয়টি দীনারও বিতরণ করিয়া দিয়া আরামে নিদ্রা গেলেন। তৎপর তিনি বলিলেন–"ঐ ছয়টি দীনার রাখিয়া যদি আমি মরিয়া যাইতাম তবে আমার অবস্থা কেমন হইত?"

হযরত হাসান বস্‌রী (র) বলেন–"আমি এমন সত্তর জন সাহাবার (রা) দর্শন লাভ করিয়াছি, যাঁহাদের পরিহিত বস্ত্র ব্যতীত অন্য কোন বস্ত্র ছিল না। তাঁহারা পরিহিত বস্ত্র দ্বারা দেহ আবৃত করত ভূপৃষ্ঠে শয়ন করিতেন এবং শরীরে মাটি লাগিবে বলিয়া মোটেই পরওয়া করিতেন।"

বিবাহ– পঞ্চম আবশ্যক বিবাহ। হযরত সহল তস্তরী (র) হযরত সুফিয়ান উইয়াইনা এবং কতিপয় আলিম বলেন যে, বিবাহে বৈরাগ্য নাই। ইহার কারণ এই যে, রাসূলে মক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সমস্ত জগতে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সংসার-বিরাগী হওয়া সত্ত্বেও পত্নীদিগকে ভালবাসিতেন এবং তাঁহার নয় জন পত্নী ছিলেন। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু সংসার বিরাগীদের আদর্শস্থানীয়; কিন্তু তাঁহারও চারিজন স্ত্রী ছিলেন। এইরূপ বিবাহ-কার্য দ্বারা তাঁহারা হয়ত বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, বৈরাগ্যের কারণে বিবাহ পরিত্যাগ করা দুরস্ত নহে। বিবাহ সন্তান উৎপত্তির উপায় এবং ইহা দ্বারা বংশ রক্ষা পায়। এতদ্ব্যতীত বিবাহে আরও বহু উপকারিতা আছে। বৈরাগ্য ভ্রমে যে-ব্যক্তি বিবাহ হইতে বিরত থাকে, তাহাকে এমন লোকে সহিত তুলনা করা যায়, যে পানাহারের আনন্দ পরিহারের উদ্দেশ্যে পানাহার একেবারে পরিত্যাগ করে। পানাহার বর্জন করিলে যেমন শরীর বিনাশ পায়, স্ত্রী গ্রহণে বিমুখ হইলেও তদ্রূপ মনুষ্যবংশ লুপ্ত হয়। তবে বিবাহ করিলে আল্লাহকে ভুলিয়া কেবল স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িবার ভয় থাকিলে এমন লোকের পক্ষে বিবাহ না করাই শ্রেয়। কিন্তু কাম-রিপু প্রবল হইলে রূপবতী সুন্দরী কামিনী পরিত্যাগ করত যে কাম-প্রবৃত্তি উত্তেজিত না করিয়া বরং নির্বাপিত করে, এমন নারী বিবাহ করা যুহ্‌দের কার্য।

হযরত ইমাম আহমদ হাম্বলের (র) সহিত বিবাহের জন্য লোকে এক পরমা সুন্দরী মহিলা ঠিক করিল এবং তাহারা বলিল– "এই মহিলার এক ভগিনীও আছেন। তিনি সুন্দরী নহেন এবং এক চক্ষুহীনা; কিন্তু তিনি খুব বুদ্ধিমতী।" হযরত ইমাম সাহেব (র) রূপবতী মহিলাকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করিলেন এবং সেই বুদ্ধিমতী কানা মহিলাকে বিবাহ করিলেন। হযরত জুনায়েদ (র)

বলেন–"ব্যবসা, বিবাহ ও হাদীস লেখা হইতে বিরত থাকাকে আমি প্রাথমিক মুরীদগণের জন্য অত্যন্ত পছন্দ করি।" তিনি আরও বলেন–"সূফীদের জন্য আমি লেখাপড়ার কাজ পছন্দ করি না। কারণ, লেখাপড়া করিলে একাগ্রতা থাকে না এবং মন প্রশান্ত হয় না।"

ধন ও মান –ষষ্ঠ প্রয়োজনীয় বিষয় ধন ও মান। বিনাশন খন্ডে বলা হইয়াছে যে, ধন ও মান মরাত্মক বিষতুল্য হইলেও উহার আবশ্যক পরিমাণ বিশেষ উপকারী। আবশ্যক পরিমাণ ধন ও মান দুনিয়ার অন্তর্গত নহে; বরং ধর্মপথের অত্যাবশ্যক বস্তুর মধ্যে পরিগণিত।

একদা হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সালাম এক ব্যক্তির নিকট কিছু ধার চাহিলেন। তৎক্ষণাৎ ওহী অবতীর্ণ হইল–"হে ইবরাহীম, আমি তোমার প্রকৃত বন্ধু; এমতাবস্থায় তুমি আমার নিকট চাহিলে না কেন?" তিনি নিবেদন করিলেন–"ইয়া আল্লাহ্, আমি জানি যে, দুনিয়াকে তুমি ভালবাস না। এই জন্য তোমার নিকট চাহিতে আমার ভয় হইয়াছিল।" আল্লাহ্ বলিলেন–"হে ইবরাহীম, যে-জিনিস নিতান্ত আবশ্যক, তাহা দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত নহে"

উপসংহার–মানুষ যখন অনাবশ্যক দ্রব্য পরকালের আশায় পরিত্যাগ করে এবং ধন ও মান আবশ্যক পরিমাণ পাইয়া সন্তুষ্ট থাকে তখন তাঁহার মন ধন ও মানে লিপ্ত থাকে। এরূপ ব্যক্তি দুনিয়াকে ভালবাসে না। ফলকথা এই যে, এইরূপ ব্যক্তি পরলোকগমন করিলে তাহার মস্তক নিম্ন দিকে এবং মুখমণ্ডল পশ্চাৎ দিকে থাকিবে না; অর্থাৎ সে দুনিয়ার দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া তাকাইবে না। যে-ব্যক্তি দুনিয়াকে শান্তি ও আরামের স্থান বলিয়া মনে করে, সে পরকালে যাইবার সময়ে ইহার দিকে বারবার ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতে থাকে। পক্ষান্তরে যে-ব্যক্তি দুনিয়াকে পায়খানা তুল্য মনে করে অর্থাৎ নিতান্ত আবশ্যকতা দেখা না দিলে ইহার দিকে দৃষ্টিপাতও করে না, এমন ব্যক্তি মরিয়া গিয়া যখন দুনিয়ারূপ পায়খানা হইতে অব্যাহতি পায়, তখন সে ইহার প্রতি কেন দৃষ্টিপাত করিবে? সংসারাসক্ত ব্যক্তির দৃষ্টান্ত এইরূপ—মনে কর, তোমাকে কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে থাকিতে দেওয়া হইবে না; কিন্তু তথায় তুমি স্বীয় গ্রীবা দৃঢ়ভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিলে অথবা মস্তকের কেশপাশ সেই স্থানে মযবুত করিয়া বাঁধিয়া রাখিলে। এমতাবস্থায় তোমাকে সেই স্থান হইতে বলপূর্বক টানিয়া বাহির করিবার সময় কেশে বন্ধন থাকার দরুন তুমি ঝুলিতে থাকিবে এবং সমস্ত

চুল সমূলে উৎপাটিত না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে তথা হইতে বাহির করা যাইবে না। টানাটানি করিয়া তোমাকে সেই স্থান হইতে বাহির করিলে চুল উপড়িয়া যাওয়ার ফলে মস্তকে যে-যখম হইবে, ইহা তোমার শরীরে থাকিয়াই যাইবে।

হযরত হাসান বস্‌রী (র) বলিতেন–"আমি এমন কতিপয় লোকের দর্শন লাভ করিয়াছি যাঁহারা বিপদাপদে পতিত হইলে এতদূর আনন্দিত হইতেন, যে তোমরা মহা সম্পদ লাভেও তত আনন্দিত হও না। তাঁহারা তোমাদিগকে দেখিলে তোমাদিগকে শয়তান বলিয়া মনে করিতেন এবং তোমরা তাঁহাদিগকে পাগল জ্ঞান করিতে।" সংসারের প্রতি মন বিরক্ত ও বিমর্ষ করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যেই বিপদাপদে নিপতিত হওয়াকে তাঁহারা এত পছন্দ করিতেন, যেমন মৃত্যুকালে তাঁহাদের হৃদয় দুনিয়ার কোন বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট না থাকে।

পঞ্চম অধ্যায়

নিয়ত (সংকল্প), সিদ্‌ক ও ইখলাস (আন্তরিকতা)

বিশুদ্ধ নিয়তের চরম আবশ্যকতা–চক্ষুষ্মান জ্ঞানিগণের নিকট ইহা দিবালোকের ন্যায় উদ্ভাসিত যে, মানবজাতির মধ্যে আবিদগণ ব্যতীত অপর সকলেই অধঃপতিত; আবার আবিদের মধ্যে আলিম ব্যতীত অপর সকলেই উৎসন্ন; আবার আলিমগণের মধ্যে যাহাদের আন্তরিকতা নাই তাহারা বিনাশপ্রাপ্ত। এইরূপ আন্তরিকতাসম্পন্ন আলিমগণও মহাসংকটের সম্মুখীন। কারণ, আন্তরিকতা ব্যতীত তাহাদের সমস্ত দুঃখকষ্ট ও পরিশ্রমই নিষ্ফল। আবার আন্তরিকতা (ইখ্‌লাস) ও সিদ্‌ক নিয়তের মধ্যেই থাকে। সুতরাং যে-ব্যক্তি নিয়তের অর্থ না বুঝে, সে তাহার সংকল্পে ইখ্‌লাস রক্ষার জন্য কিরূপ তৎপর হইবে? এইজন্যই এই অধ্যায়টি তিন অনুচ্ছেদে ভাগ করিয়া প্রথম অনুচ্ছেদে নিয়তের অর্থ, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে ইখলাসের পরিচয় এবং তৃতীয় অনুচ্ছেদে সিদ্‌কের হাকীকত বর্ণনা করা হইবে।

প্রথম অনুচ্ছেদ—নিয়ত

নিয়তের ফযীলত–সকলের পক্ষেই নিয়তের ফযীলত বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। কারণ, নিয়ত যাবতীয় পুণ্যকর্মের প্রাণ। নিয়ত লইয়াই বিচার হইবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা কার্যের নিয়তই দেখিয়া থাকেন। এইজন্যই রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের আকৃতি ও ধনের প্রতি দৃষ্টপাত করিবেন না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর (অর্থাৎ কি উদ্দেশ্যে কাজ কর তাহা) ও আমল দেখিবেন।" অন্তরই নিয়তের স্থান বলিয়া তিনি ইহা দেখিবেন। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"নিয়ত অনুযায়ী আমল হইয়া থাকে এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ নিয়ত অনুরূপ ফল পায়। যে-ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে হিজরত করে (অর্থাৎ জিহাদ বা হজ্বের জন্য আল্লাহ্‌র রাস্তায় বাহির হয়), তাহার হিজ্‌রত

আল্লাহ্‌র জন্যই হয়। আর যে-ব্যক্তি ধন লাভ বা কোন মহিলাকে হস্তগত করিবার উদ্দেশ্যে হিজরত করে, তাহার হিজ্‌রত আল্লাহ্‌র জন্য হইবে না; বরং ইহা তাহার নিয়ত অনুযায়ী হয়।" তিনি বলেন–"আমার উম্মতের মধ্যে বহু লোক শয্যার উপর বালিশে মাথা রাখিয়া শহীদ হইয়া প্রাণত্যাগ করে। আবার বহু লোক যুদ্ধে প্রবৃত্ত দুই সৈন্যদলের মধ্যে নিহত হয়; আল্লাহ্ তাহাদের নিয়ত উত্তমরূপে অবগত আছেন।" (অর্থাৎ নিয়ত বিশুদ্ধ না হইলে যুদ্ধে নিহত হইয়াও শহীদের মরতবা পায় না। আবার নিয়ত বিশুদ্ধ থাকিলে বিছানায় পড়িয়া মরিলেও শহীদের মরতবা পায়।) তিনি বলেন–"বান্দা এমন বহু সৎকার্য করে যাহা ফিরিশ্‌তাগণ ঊর্ধ্বে লইয়া যায়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এই সমস্ত কার্য তাহাদের আমলনামা হইতে কাটিয়া ফেলিতে আদেশ করেন এবং বলেন–'সে এই কাজ আমার জন্য করে নাই। অমুক কার্য তাহার আমলনামায় লিখিয়া লও।' ফিরিশ্‌তাগণ নিবেদন করেন –"ইয়া আল্লাহ্, এই কার্যত সে করে নাই।' আল্লাহ্ বলেন–'সেই এ সকল কার্যের নিয়ত করিয়াছিল।"

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"চারি প্রকার লোক আছে। এক প্রকার লোক ধনবান এবং শরীয়তের বিধানমতে ধন ব্যয় করে। দ্বিতীয় প্রকার লোক (নির্ধন, তাহারা) বলে–আমাদের ধন থাকিলে আমরাও তদ্রূপ (প্রথম প্রকার লোকের ন্যায়) ব্যয় করিতাম। এই উভয় প্রকার লোক সমান সওয়াব পাইবে। তৃতীয় প্রকার লোক অন্যায়ভাবে ধন ব্যয় করে। চতুর্থ প্রকার লোক বলে–ধন থাকিলে আমরাও ঐরূপ অপব্যয় করিতাম। এই দুই শ্রেণীর লোক সমান পাপী হইবে।" এই হাদীসের অর্থ এই যে, সৎকার্য করিলে যে-সওয়াব পাওয়া যায়, শুধু ইহার নিয়ত থকিলেও তদ্রূপ সওয়াব পাওয়া যায়। হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু হইতে বর্ণিত আছে– "তাবুক-যুদ্ধের দিন রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বাহিরে আসিয়া বলিলেন–'সফর ও ক্ষুধাজনিত যে-কষ্ট আমরা ভোগ করিতেছি, মদীনাতে এমন বহু লোক আছে, যাহারা উহাতে আমাদের সমান অংশী হইতেছে।' (অর্থাৎ তাহারা আমাদের সমান সওয়াব পাইতেছে।) আমরা নিবেদন করিলাম–হে আল্লাহ্‌র রাসূল, তাহারা ত সফরের কষ্ট ভোগ করে নাই; কিরূপে তাহারা আমাদের সমান অংশী হইবে? হযরত (সা) বলিলেন–'যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকায় তাহারা আমাদের সঙ্গে আসিতে পারে নাই। অন্যথায় তাহাদের নিয়ত আমাদের নিয়তের অনুরূপ।"

বানী ইসরাঈল বংশের এক ব্যক্তি বালুকাময় পাহাড়ের উপর দিয়া পথ চলিতেছিল। তখন সেই দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ ছিল। সেই ব্যক্তি মনে মনে বলিল–"আমি এই পাহাড় পরিমাণ গম পাইলে তৎসমুদয়ই দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতাম।" তৎকালীন পয়গম্বরের (আ) নিকট ওহী অবতীর্ণ হইল–"অমুক ব্যক্তিকে জানাইয়া দাও–"আল্লাহ্ তোমার দান গ্রহণ করিয়াছেন। তোমার নিকট যদি সেই পরিমাণ গম থাকিত এবং উহা সমস্তই দান কারিয়া দিতে তবে তুমি এতটুকু সওয়াবই পাইতে।" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"যাহার সংকল্প ও শক্তি দুনিয়া অর্জনে নিয়োজিত থাকে, তাহার চক্ষুর সম্মুখে সর্বদা দরিদ্রতা ঘুরিয়া বেড়ায় এবং দুনিয়ার মায়াতে আবদ্ধ হইয়া সে পরলোকগমন করেন। আর যাহার সংকল্প ও শক্তি পরকালের কার্যে নিবদ্ধ থাকে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার মনকে সম্পূর্ণ অভাবমুক্ত রাখেন এবং সে সংসারাসক্তি হইতে মুক্ত থাকিয়া পরলোকগমন করে।" তিনি বলেন–"মুসলমান যখন কাফিরের সঙ্গে ধর্মযুদ্ধে রণক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হয়, তখন ফিরিশ্‌তাগণ তাহাদের নাম লিখিতে আরম্ভ করে যে– 'অমুক ব্যক্তি সাম্প্রদায়িকতার বশীভূত হইয়া যুদ্ধ করিতেছে। অমুক ব্যক্তি জেদের বশীভূত হইয়া যুদ্ধ করিতেছে; পরিশেষে লিখে, অমুক অমুক ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় শহীদ হইয়াছে।' যে ব্যক্তি কালেমা তাওহীদ সমুন্নত করিবার উদ্দেশ্যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, সে আল্লাহ্‌র পথে আছে।" তিনি বলেন–"যে-ব্যক্তি স্ত্রীর মোহরানা দিবে না বলিয়া ইচ্ছা রাখে সে যিনাকার। আর যে-ব্যক্তি ঋণ পরিশোধের অনিচ্ছা পোষণ করিয়া ঋণগ্রহণ করে, সে চোর।"

জ্ঞানিগণ বলিয়াছেন–"অগ্রে সৎকার্যের সংকল্প সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ কর, তৎপর কার্য কর।" এক ব্যক্তি এমন কোন সৎকর্ম সম্বন্ধে জানিতে চাহিল যাহা সে দিবারাত্র করিতে পারে এবং অনবরত সওয়াব পাইতে থাকে। জ্ঞানিগণ তাহাকে উপদেশ দিয়া বলিলেন–"সৎকর্ম যদি করিতেও না পার তবুও সৎকর্ম করিবার ইচ্ছা সর্বদা মনে জাগরুক রাখ। তাহা হইলে সৎকর্ম করিয়া যে সওয়াব পাইতে তাহাই পাইবে।" হযরত আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন–"কিয়ামতের দিন লোকের পুনরুত্থান তাহাদের সংকল্প অনুরূপ হইবে।" হযরত হাসান বসরী (র) বলেন– "জীবনের সামান্য কয়েক দিনের সৎকার্যের ফলে চিরস্থায়ী বেহেশ্‌ত পাওয়া যাইবে না; এবং নিয়তের কারণে পাওয়া যাইবে, কেননা নিয়তের কোন পরিসীমা নাই।"

নিয়তের হাকীকত–তিনটি জরুরী পদার্থের সমাবেশ না হওয়া পর্যন্ত মানব দ্বারা কোন কার্য সংঘটিত হইতে পারে না। তিনটি পদার্থ এই–(১) জ্ঞান, (২) ইচ্ছা ও (৩) শক্তি। উদাহরণস্বরূপ দেখ, খাদ্যদ্রব্য না দেখিলে কেহই আহার করে না; আবার দেখিলেও ইচ্ছা না থাকিলে কেহ খায় না। ইহার পর আহারের ইচ্ছা থাকিলেও তাহার হাত শক্তিহীন অবশ হইলে সে খাইতে পারে না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, প্রত্যেক ক্রিয়ার অগ্রে জ্ঞান, ইচ্ছা, শক্তি এই তিনটি বস্তুর সমাবেশ নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু কার্যটি শক্তির অধীন; শক্তি আবার ইচ্ছার অধীন। কারণ, ইচ্ছা শক্তিকে কর্মে প্রবৃত্ত করিয়া রাখে এবং ইচ্ছা জ্ঞানের আজ্ঞাধীন। কেননা মানুষ বহু কিছু দেখে, অথচ তৎসমুদয়ের ইচ্ছা ও লোভ তাহার মনে জাগ্রত হয় না। কিন্তু বিনা জ্ঞানে ইচ্ছা ও কামনা উদ্রেক হয় না। কেননা যে-সম্বন্ধে মানুষের কোন জ্ঞান নাই, উহার ইচ্ছা সে কিরূপে করিবে?

উপরিউক্ত তিনটি বস্তুর মধ্যে 'ইচ্ছা'র নামই নিয়ত। নিয়ত জ্ঞান ও শক্তি হইতে উদ্ভূত নহে। যে অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনা মানুষকে কার্যে প্রবৃত্ত করে এবং ইহাতে লাগাইয়া রাখে তাহাকেই ইচ্ছা (ইরাদা) বলে। এই ইচ্ছাকেই উদ্দেশ্য, নিয়ত এবং কস্‌দও বলে। এই তিনটি শব্দই সম-অর্থবোধক। যে উদ্দেশ্য মানুষকে কার্যে প্রবৃত্ত করে, ইহার সংখ্যা কখনও একটি, আবার কখনও একাধিক হইয়া থাকে। কার্যের উদ্দেশ্য যখন একটিমাত্র থাকে তখন ইহাকে বিশুদ্ধ (খালিস) বলে। ইহার উদাহরণ এইরূপ—মনে কর, এক ব্যক্তি উপবিষ্ট আছে। এক ব্যাঘ্র তাহাকে গ্রাস করিতে চাহিল। এমন সময় সেই ব্যক্তি সেই স্থান হইতে দ্রুতবেগে পলায়ন করে। এ-স্থলে সেই ব্যক্তির একটিমাত্র উদ্দেশ্য, একটিমাত্র বাসনা অর্থাৎ পলাইয়া যাওয়া। এইরূপ কোন ভক্তিভাজন সম্ভ্রান্ত লোক নিকটে আসিলে মানুষ দণ্ডায়মান হয়। এ-স্থলেও সম্মান প্রদর্শন ব্যতীত দণ্ডায়মান হওয়ার কার্যের অপর কোন উদ্দেশ্য নাই। সুতরাং এই উদ্দেশ্যও খালিস অর্থাৎ একক ও অমিশ্র।

আবার এই কার্যের একাধিক উদ্দেশ্য তিন প্রকার হইয়া থাকে। **প্রথম প্রকার**–একাধিক উদ্দেশ্যের প্রত্যেকটিই এরূপ যে, ইহাতের একটিও মানুষকে কার্যে রত করিয়া রাখিতে পারে। যেমন, মনে কর, কোন দরিদ্র আত্মীয় আসিয়া তোমার নিকট একটি টাকা চাহিল। তুমি আত্মীয় ও দরিদ্র জ্ঞানে তাহাকে একটি টাকা দান করিলে এবং মনে মনে বলিলে–"এই ব্যক্তি দরিদ্র না হইলেও

তাহাকে একটি টাকা দিতাম; অথবা সে আত্মীয় না হইয়া শুধু দরিদ্র হইলেও দিতাম। এমন স্থলে তোমার ঐ একটি টাকা দানের মধ্যে দুইটি উদ্দেশ্য কার্যকর ছিল। সুতরাং তোমার নিয়ত ভাগাভাগি হইয়া পড়িল। ইহার আর একটি দৃষ্টান্ত এই যে মনে কর, একটি প্রস্তর স্থানান্তরিত করিতে হইবে। দুইজন সমান শক্তিশালী লোক আসিয়া দাঁড়াইল। উভয়েই এত বলবান যে, প্রত্যেকেই একা প্রস্তরটি সরাইতে পারে; তথাপি দুইজন একত্রে ধরাধরি করিয়া ইহা অতি সহজে সরাইয়া দিল। **দ্বিতীয় প্রকার**–ঐ দানের সময়ে তুমি যদি বিবেচনা করিতে যে, সেই প্রার্থী দরিদ্র না হইয়া যদি শুধু আত্মীয় হইত অথবা দরিদ্রই হইত কিন্তু আত্মীয় না হইয়া অপর লোক হইত, তবে তুমি টাকা দিতে না; একসঙ্গে দরিদ্র ও আত্মীয় হওয়ার জন্যই তুমি দান করিয়াছ; সেই স্থলে দুইটি স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য একত্র মিলিত হইয়া দান-কার্যটি সম্পন্ন হইয়াছে। ইহার দৃষ্টান্ত এই—মনে কর, দুই জন দুর্বল ব্যক্তি একত্র মিলিত হইয়া ধরাধরি করিয়া ঐ প্রস্তরটি সরাইল। কিন্তু তাহাদের কেহই একাকী ইহা সরাইতে পারিত না। **তৃতীয় প্রকার**–দুইটি উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি এমন দুর্বল যে, ইহা কখনই মানুষকে কার্যে প্রবৃত্ত করিতে পারে না; কিন্তু অপরটি এমন বলবান যে, ইহা একাকীই তাহাকে কার্যে প্রবৃত্ত করিতে পারে। তবে দুর্বল উদ্দেশ্যটিও মিলিত হইয়া কার্যটি নিতান্ত সহজ করিয়া দিল। যেমন, মনে কর, এক ব্যক্তি একাকী থাকিলেও তাহাজ্জুদের নামায পড়ে; কিন্তু লোক সমাবেশে তাহাজ্জুদ-নামায পড়া তাহার পক্ষে অতি সহজ হইয়া উঠে এবং সে তখন নামাযে আনন্দও অধিক পাইয়া থাকে। এইরূপ নামাযী ব্যক্তির মনে পুণ্য-প্রাপ্তির আশা থাকিলে লোককে দেখাইবার উদ্দেশ্যে যে তাহাজ্জুদ পড়িল না। ইহার উদাহরণ এইরূপ–মনে কর, একজন বলবান ব্যক্তি উক্ত প্রস্তরটি একাকীই সরাইতে পারে; কিন্তু একটি দুর্বল লোকও যদি তাহাকে সাহায্য করে তবে কাজটি নিতান্ত সহজ হইয়া পড়ে।

কার্যের উদ্দেশ্যের উপরিউক্ত তিন শ্রেণীর প্রত্যেকটির জন্যই আবার পৃথক পৃথক বিধান আছে। ইখ্‌লাসের বর্ণনাকালে এ-সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে। সেই আলোচনা হইতে তোমরা বুঝিতে পারিবে যে, যে-উদ্দেশ্যে মানুষ কাজে প্রবৃত্ত হয়, তাহা কোন স্থলে একটিমাত্র থাকে, আবার কোন একাধিক উদ্দেশ্য একত্র মিলিয়া কাজ করে।

শারীরিক কার্য অপেক্ষা নিয়ত উৎকৃষ্ট– রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন نِيَّتُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهِ – অর্থাৎ "মুমিনের নিয়ত, (সংকল্প) তাহার কার্য অপক্ষো উৎকৃষ্ট।" এই হাদীসের অর্থ ইহা নহে যে, কর্মহীন নিয়ত, নিয়তহীন কর্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কারণ ইহা নিতান্ত সুস্পষ্ট যে, নিয়তহীন কর্ম ইবাদহ নহে এবং কর্মহীন নিয়ত ইবাদতের মধ্যে গণ্য। ইহার কারণ এই যে, শরীর দ্বারা ইবাদত সম্পন্ন হয় এবং মন দ্বারা নিয়ত নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এই দুইটির মধ্যে যাহা অন্তরের সহিত সম্বন্ধ রাখে, তাহা উৎকৃষ্ট। আবার অন্তরের কার্য উৎকৃষ্ট হওয়ার কারণ এই যে, অন্তরের স্বভাবের পরিবর্তন শারীরিক ইবাদতের উদ্দেশ্য এবং শরীরের স্বভাবের পরিবর্তন নিয়ত অর্থাৎ আন্তরিক ইবাদতের উদ্দেশ্য নহে। লোকে মনে করে, ইবাদতের জন্য নিয়ত আবশ্যক; কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, নিয়ত বিশুদ্ধ করিবার জন্যই ইবাদত আবশ্যক। কেননা মনকে এ-সংসার হইতে ফিরাইয়া লওয়াই যাবতীয় ইবাদতের উদ্দেশ্য। কারণ আত্মাকেই পরকালে যাইতে হইবে এবং উহাকেই তথায় সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য ভোগ করিতে হইবে। শরীর যদিও মাধ্যমরূপে থাকিবে তথাপি ইহা আত্মারই অধীন; যেমন হজ্বে যাওয়ার জন্য উষ্ট্র আবশ্যক। কিন্তু হজ্বযাত্রীকে বহন করিয়া মক্কা শরীফে লইয়া যায় বলিয়া উষ্ট্র কখনই হাজী হয় না। হৃদয়কে ফিরাইয়া লওয়ার অর্থ ইহা ছাড়া আর কিছু নহে যে, ইহাকে সংসারের দিক হইতে ফিরাইয়া পরকালের দিকে নিবদ্ধ করিতে হইবে; বরং সংসার ও পরকাল উভয় হইতে ফিরাইয়া কেবল আল্লাহ্‌র দিকে নিবিষ্ট রাখিতে হইবে। হৃদয়ের অভিলাষ ও ইচ্ছাই উহার মুখমণ্ডল। সংসারের অভিলাষ হৃদয়ে প্রবল হইলে বুঝিতে হইবে, ইহার লক্ষ্য সংসারের দিকে নিবিষ্ট আছে। হৃদয় সংসারের সহিত সম্বন্ধ রাখিতে চাহে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনের এই অবস্থাই থাকে। আল্লাহ্ ও পরকারের অভিলাষ হৃদয়ে প্রবল হইয়া উঠিলে বুঝিবে ইহার পূর্ব অবস্থা পরিবর্তিত হইয়াছে এবং সংসারের প্রতি বিমুখ হইয়াছে। অতএব হৃদয়ের এইরূপ বিবর্তনই যাবতীয় ইবাদতের উদ্দেশ্য।

তদ্রূপ মস্তককে উচ্চ হইতে নামাইয়া ভূপৃষ্ঠে স্থাপন করা সিজ্‌দার উদ্দেশ্য নহে; বরং মনের অহংকার ভাব পরিবর্তন করত ইহাকে বিনীত, নম্র ও অধীন করিয়া তোলাই সিজদার উদ্দেশ্য। 'আল্লাহু আক্‌বার' বলার উদ্দেশ্য রসনা সঞ্চালন নহে; বরং আত্মাভিমান হইতে মনকে ফিরাইয়া আল্লাহ্‌র মহত্ত্ব ও

শ্রেষ্ঠত্ব হৃদয়ে জাগ্রত করিয়া দেওয়াই 'আল্লাহু আক্‌বার' বলার উদ্দেশ্য। হজ্বের সময়ে প্রস্তর নিক্ষেপ-কার্যে হস্ত-সঞ্চালন বা বহু প্রস্তর একত্র করা উদ্দেশ্য নহে; বরং হৃদয়কে আল্লাহ্‌র দাসত্বে অকপট ও দৃঢ়পদ করিয়া তোলা—প্রবৃত্তি ও বুদ্ধির অধীনতা ছিন্ন করত কেবল আল্লাহ্‌র আদেশের অধীন হওয়া এবং স্বয়ং আপনাকে পরিচালনা করিবার ক্ষমতা বিসর্জনপূর্বক নিজকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র নিকট সমর্পণ করিয়া দেওয়াই উহার উদ্দেশ্য। এইজন্য হজ্ব সম্পাদনকালে বলা হয় لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ حَقًّا تَعَبُّدًا وَّرِقًّا – অর্থাৎ "প্রকৃত ইবাদতকার্যে দাসের ন্যায় হজ্বের জন্য তোমার সমীপে দাঁড়াইলাম।" ছাগ্‌-গবাদির জীবন বিসর্জন কুরবানীর উদ্দেশ্য নহে, বরং অন্তরের কৃপণতা বাহির করিয়া ফেলা এবং গৃহপালিত প্রাণীদের প্রতি মানব-প্রকৃতির নির্দেশ অনুসারে মমতাশীল না হইয়া আল্লাহ্‌র আদেশ অনুসারে ইহাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করাই ইহার উদ্দেশ্য। যবেহ্ করিবার আদেশ হইলে যেন এরূপ তর্ক মনে উদিত না হয় যে, এই নিরীহ পশুগুলি কী পাপ করিয়াছে যে, তাহাদিগকে এত কষ্ট দিয়া হত্যা করিব? বরং সমস্ত ক্ষমতা ছাড়িয়া দিয়া নিজের অস্তিত্ব ভুলিয়া যাইতে হইবে। বাস্তবপক্ষে তুমি আমি কিছুই নহি–বিশ্ব-সংসারে যাহা কিছু হয় তৎসমুদয় কিছু নহে–কেবল আল্লাহ্ তা'আলারই অস্তিত্ব আছে। সকল ইবাদতেই এইরূপ একই উদ্দেশ্য নিহিত আছে।

আল্লাহ্ তা'আলা মানবহৃদয়কে এমন স্বভাব-সম্পন্ন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন যে, যখন কোন ইচ্ছা ও অভিলাষ তন্মধ্যে জাগ্রত হয় তখন যদি দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সেই ইচ্ছার ইঙ্গিত অনুসারে সঞ্চালিত হয়, তবে সেই ভাবটি হৃদয়ে দৃঢ়রূপে বসিয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে কর, ইয়াতীম সন্তান-সন্ততির প্রতি কাহারও মনে দয়ার ভাব উদ্রেক হইলে সেই ব্যক্তি যদি উক্ত সন্তানের শরীরে হাত বুলায় তবে অনাথ সন্তান-সন্ততির প্রতি তাহার দয়ার ভাব সুদৃঢ় হইয়া উঠে এবং তাহার হৃদয়ে মমতাবোধ বৃদ্ধি পায়। এইরূপ হৃদয়ে বিনয়-ভাব উদিত হইলে মানব যদি স্বীয় ললাট ভূপৃষ্ঠে স্থাপন করে তবে সেই বিনয় ভাব অন্তরে দৃঢ়ভাবে বসিয়া যায়। মঙ্গলপ্রাপ্তি সকল ইবাদতের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ মানব এইজন্য ইবাদত করিবে যেন তাহার মন দুনিয়া হইতে একেবারে উঠিয়া গিয়া একমাত্র আখিরাতের দিকে নিবিষ্ট হইয়া থাকে। এই উদ্দেশ্যে ইবাদত করিলে আখিরাতের দিকে হৃদয়ের টান ঘনীভূত হইতে থাকে। অতএব বুঝা গেল যে,

অভিলাষ ও নিয়তকে বলবান করিয়া তোলার জন্যই ইবাদতের আবশ্যক। একথা অবশ্য সত্য যে, প্রথমে নিয়তের কারণেই ইবাদতকার্য সম্পন্ন হয়।

এ-পর্যন্ত যাহা বলা হইল তাহা হইতে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইল যে, নিয়ত ইবাদত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কারণ, নিয়তের স্থান হৃদয় এবং ইবাদতের প্রভাব ভিন্ন স্থান হইতে হৃদয়ে অনুপ্রবেশ করে। এই প্রভাব যদি অন্তরে প্রবেশ করে তবে ইবাদত ফলপ্রদ; আর যদি এই প্রভাব অন্তরে প্রবিষ্ট না হয় এবং অমনোযোগিতার সহিত ইবাদত করা হয়, তবে ইহা বিনষ্ট ও নিষ্ফল হইয়া যায়। কিন্তু এই কারণে কর্মহীন নিয়ত বিনষ্ট হয় না; কেননা অন্তরের মধ্যেই নিয়তের স্থান। কাজেই এ-স্থলে অমনোযোগিতার কোন অধিকার নাই। একটি উপমা দ্বারা কথাটি ভালরূপে বুঝানো যাইতে পারে। মনে কর, কাহারও উদরে বেদনা হইলে সে যদি ঔষধ সেবন করে তবে ইহা সোজাসুজি উদরে প্রবেশ করে। আবার বক্ষঃস্থলে ঔষধের প্রলেপ দিলে ইহার ক্রিয়া যদি ক্রমে ক্রমে অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তবে ইহাতেও উপকার হয়। কিন্তু প্রলেপের ঔষধের তুলনায় যে-ঔষধ সোজাসুজি উদরে প্রবেশ করে ইহা অধিকতর ফলপ্রদ হইয়া থাকে। প্রলেপের ঔষধের লক্ষ্য বক্ষস্থল নহে; বরং বহির্দেশে প্রযুক্ত ঔষধ অভ্যন্তরে প্রবেশ করত উদরে উহার ক্রিয়া প্রকাশ পাওয়াই প্রলেপের উদ্দেশ্য। সুতরাং বক্ষঃস্থলে প্রযুক্ত ঔষধের ক্রিয়া উদরে প্রবেশ না করিলে ইহার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া গেল। পক্ষান্তরে যে-ঔষধ উদরে প্রবেশ করে ইহা বক্ষঃস্থলে না পৌঁছিলেও ব্যর্থ হয় না।

মার্জনীয় ও অমার্জনীয় প্রবৃত্তির কুপরামর্শ–রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "প্রবৃত্তি মনে যে কুপরামর্শ প্রদান করে, আল্লাহ্ তজ্জন্য আমার উম্মতের দোষ ধরিবেন না।" সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম উভয় হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, যদি কেহ পাপ-কার্যের ইচ্ছা করে, অথচ সেই পাপ কার্য না করে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা ফিরিশতাগণকে উহা তাহার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করিতে নিষেধ করেন। কিন্তু সেই ব্যক্তি যদি ইচ্ছানুরূপ পাপ-কার্য করে তবে তিনি ফিরিশতাগণকে একটি মাত্র পাপ লিপিবদ্ধ করিতে আদেশ করেন। আর যদি কেহ কোন সৎকার্যের ইচ্ছা করে, অথচ সেই কার্য না করে, তবে তাহার আমলনামায় একটি পুণ্য লিখিতে আদেশ করেন। কিন্তু সেই ব্যক্তি যদি ইচ্ছানুরূপ সৎকার্য করে তবে তাহার আমলনামায় দশটি পুণ্য লিখিতে আদেশ করেন। অন্যান্য হাদীসে দেখা যায় যে, ফিরিশতাগণ সেই পুণ্য

সাত শত পর্যন্ত বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। এই হাদীস হইতে কেহ কেহ বুঝিয়া লইয়াছে যে, স্বীয় ইচ্ছায় ও বুঝিয়া-শুনিয়া লোকে পাপাভিলাষ মনে জাগাইলে সে তজ্জন্য দায়ী হইবে না। কিন্তু এইরূপ মনে করা ভুল। কারণ, ইতঃপূর্বে বলা হইয়াছে যে, আত্মাই মূল পদার্থ এবং শরীর তাহার অধীন। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاِنْ تُبْدُوْا مَافِى اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ –

অর্থাৎ "তোমাদের অন্তরে যাহা আছে তাহা যদি প্রকাশ কর বা গোপনে রাখ, আল্লাহ্ ইহার হিসাব লইবেন।" (সূরা বাকারাহ্, শেষ রুকূ, ৩ পারা।) তিনি আরও বলেন ঃ

اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلاً –

অর্থাৎ "নিশ্চয় কর্ণ এবং অন্তঃকরণসমূহের প্রত্যেকের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে।" (সূরা বানী ইস্‌রাঈল, ৪ রুকূ, ১ পারা।) আল্লাহ্ অন্যত্র বলেনঃ

لَايُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِى اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْاَيْمَانَ –

অর্থাৎ "তোমাদের বেহুদা শপথের জন্য আল্লাহ্ তোমাদিগকে ধরিবেন না। কিন্তু তোমরা যে-সমস্ত পাকা শপথ করিয়াছ তজ্জন্য তিনি তোমাদিগকে ধরিবেন।" (সূরা মাইদা, ১২ রুকূ ৭ পারা।)

যাহা হউক, অহংকার, কপটতা, আত্মগর্ব, রিয়া , ঈর্ষার জন্য মানুষ দায়ী হইবে, এ কথা সকলেই স্বীকার করেন। এ সমস্তই অন্তরের কাজ।

প্রবৃত্তির চতুর্বিধ কুপরামর্শ–যাহা হউক, প্রবৃত্তির পরামর্শ কোন্ স্থলে মার্জনীয় এবং কোন্ অবস্থায় মার্জনীয় নহে, ইহার মীমাংসা এই যে, যে-সমস্ত কথা মনে উদিত হয়, ইহার চারিটি অবস্থা আছে। তন্মধ্যে দুইট অবস্থাতে মানুষের ক্ষমতা চলে না, সুতরাং তজ্জন্য মানব দায়ী নহে। আর দুইটি অবস্থাতে মানবের ক্ষমতা চলে এবং তজ্জন্য সে দায়ী হইবে। একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টি বুঝানো যাইতেছে। মনে কর, তুমি আপন মনে পথ চলিতেছ। এমন সময় এক মহিলা তোমার অনুগমন করিতে লাগিল। এমতাবস্থায় প্রথমত, তোমার মনে এরূপ ভাব জাগিল যে, তুমি পশ্চাতে ফিরিয়া তাকাইলে সেই মহিলা তোমার দৃষ্টিপথে পতিত হইবে। মনের এইরূপ ভাবকে হাদীসে নফ্‌স (প্রবৃত্তির প্ররোচনা) বলে। দ্বিতীয়ত, সেই মহিলার দিকে ফিরিয়া তাকাইবার

আগ্রহ তোমার মনে জন্মিল। ইহাকে প্রবৃত্তির ঝোঁক বলে। কাম-বাসনার দরুন মনে এইরূপ আগ্রহের উদ্রেক হয়। তৃতীয়ত, প্রবৃত্তি তোমাকে আদেশ করিল যে, মহিলাটির দিকে ফিরিয়া দেখা আবশ্যক। যে-স্থলে কোন ভয় ও বিপদের আশঙ্কা না থাকে, এমন স্থানেই প্রবৃত্তির এইরূপ আদেশ হইয়া থাকে। কাম-বাসনা যাহা ইচ্ছা করে, অন্তরও তাহা আদেশে করিবে, ইহা অবশ্যম্ভাবী নহে। বরং কখন কখন অন্তর প্রবৃত্তির ইচ্ছানুসারে কাজ করিতে নিষেধ করে। ইহাকে অন্তরের আদেশ বলে। চতুর্থত, তুমি মহিলাটিকে ফিরিয়া দেখিবার ইচ্ছা করিলে। এখন যদি আল্লাহ্ বা মানুষের ভয়ে অন্তরের তদ্রূপ আদেশ অগ্রাহ্য অথবা রহিত না কর, তবে শীঘ্রই তোমার সেই ইচ্ছা অটল হইয়া পড়িবে। উল্লিখিত প্রথম দুই অবস্থায় অর্থাৎ প্রবৃত্তির প্ররোচনা ও প্রবৃত্তির ঝোঁকের কারণে মানুষ দায়ী হইবে না। কারণ এই দুই অবস্থা মানুষের ক্ষমতাধীন নহে। এই সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন ঃ

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا – অর্থাৎ "আল্লাহ্ কাহাকেও তাহার সাধ্যের অতিরিক্ত ক্লেশ দেন না।" (সূরা বাকারাহ, শেষ রুকূ, ৩ পারা।)

হযরত ওসমান ইব্নে মজউ'ন রাযিয়াল্লাহু আন্হু একদা রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার হৃদয়ের যে-সকল ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন উহা হাদীসে নফ্স অর্থাৎ প্রবৃত্তির প্ররোচনার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি হযরতের (সা) নিকট নিবেদন করিলেন –"বিবাহের বাসনা হইতে অব্যাহতি পাওয়া জন্য আমার মন আমাকে অণ্ডকোষ ছিন্ন করিয়া ফেলিতে বলে।" হযরত (সা) বলিলেন–"ইহা করিও না। কারণ, রোযা রাখা আমার উম্মতের পক্ষে অণ্ডকোষ ছিন্ন করার তুল্য।" তিনি নিবেদন করিলেন–"আমার মন আমাকে পত্নী ত্যাগ করিতে বলে।" হযরত (সা) বলিলেন–"উগ্রতা প্রদর্শন করিও না। কেননা, বিবাহ আমার সুন্নত।" তিনি নিবেদন করিলেন–"হে আল্লাহ্র রাসূল, সন্ন্যাসীদিগের ন্যায় পাহাড়ে যাইয়া উপবেশ করিয়া থাকিতে আমার মন চায়।" হযরত (সা) বলিলেন–"ইহা করিও না। কারণ, হজ্ব ও জিহাদ করা আমার উম্মতের জন্য সন্ন্যাস।" তিনি নিবেদন করিলেন–"আমার মন আমাকে গোশ্ত খাইতে নিষেধ করে।" হযরত (সা) বলিলেন–"ইহা করিও না। কারণ, আমি গোশ্ত পছন্দ করি। কেননা গোশ্ত পাইলে আমি খাইতাম এবং আমি আল্লাহ্র নিকট চাহিলে তিনি দিতেন।"

যাহা হউক, যে-সমস্ত ভাব হযরত ওসমান ইব্নে মজউ'ন রাযিয়াল্লাহু আন্হুর হৃদয়ে উদিত হইয়াছিল তৎসমুদয়ই অন্তরের প্ররোচনা এবং এই সকল মার্জনীয়। কারণ, তদনুসারে কাজ করিবার তিনি সংকল্প করেন নাই, উহা কেবল মনের পরামর্শ ছিল। অপর দুইটি অবস্থা মানবের স্বাধীন ইচ্ছায় অন্তরে দেখা দেয়। তন্মধ্যে একটি অন্তরের আদেশ; অপরটি প্রবৃত্তির এমন ঝোঁক যে, এই কাজটি করার যোগ্য এবং উহা করার আন্তরিক সংকল্প। এই দ্বিবিধ অবস্থার জন্য মানব দায়ী। যদিও লোকলজ্জা ও ভয় অথবা অন্য কোন বাধার কারণে অন্তরের আদেশ অনুসারে কাজ করিতে অক্ষম হয় তথাপি মানুষ দায়ী হইবে। 'মানব দায়ী হইবে' ইহার অর্থ এই নহে যে, কেহ তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবে এবং তজ্জন্য তাহাকে শস্তি দিবে। কারণ, ক্রোধ-প্রবৃত্তি ও প্রতিশোধ গ্রহণের ভাব হইতে আল্লাহ্ সম্পূর্ণ পাকপবিত্র। ইহার অর্থ এই, মানব নিজস্ব স্বাধীন ক্ষমতায় অন্যায় করিবার ইচ্ছা করিলে তাহার হৃদয়ে এইরূপ অবস্থান্তর ঘটে যে, তজ্জন্য সে আল্লাহ্ হইতে দূরবর্তী হইয়া পড়ে। ইহাই মানবের চরম দুর্ভাগ্য। এইজন্যই ইতঃপূর্বে বলা হইয়াছে যে, নিজের এবং সমস্ত দুনিয়ার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া একমাত্র আল্লাহ্র দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করিয়া রাখাই মানবের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয়। হৃদয়ের অভিলাষ ও সম্বন্ধই ইহার মুখ। সংসারের সহিত সম্বন্ধ আছে এমন বস্তুর অভিলাষ করিলে সংসারের সহিত হৃদয়ের সম্বন্ধ মযবুত হইয়া পড়ে এবং যাহা লাভ করা প্রকৃত উদ্দেশ্য, তাহা হতে বহু দূরে সরিয়া পড়িতে হয়।

'মানুষ দায়ী ও অভিশপ্ত হইয়াছে' ইহার অর্থ এই যে, সে দুনিয়াতে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে এবং আল্লাহ্ হইতে বহু দূরে সরিয়া গিয়াছে। এই দায়ী ও অভিশপ্ত হওয়ার কার্য হৃদয় দ্বারা, হৃদয় হইতে এবং হৃদয়ের মধ্যেই সংঘটিত হয়। মানুষের ইবাদতে আনন্দিত হইয়া বা তাহার পাপে ক্রুদ্ধ হইয়া কেহই তাহাকে প্রতিফল দিতে আসে না। তবে লোকে যেন বুঝিতে পারে এইজন্যই তাহাদের বুদ্ধি অনুসারে পাপ করিলে শাস্তি ও পুণ্য করিলে পুরস্কার পাওয়া যায়, এইরূপ বলা হইয়াছে। যাহারা এই গুপ্ত রহস্য বুঝিতে পারিয়াছেন, তাহারা নিঃসন্দেহে জানে যে, হৃদয়ের অবস্থার কারণেই মানুষ দায়ী হয়। ইহার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ এই যে, রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"দুই ব্যক্তি যদি অস্ত্রশস্ত্র লইয়া পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় এবং একজন নিহত হয় তবে হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়েই দোযখে যাইবে।" সাহাবাগণ (রা) নিবেদন

করিলেন –"হে আল্লাহ্‌র রাসূল, নিহত ব্যক্তি কেন দোযখে যাইবে। হযরত (সা) বলিলেন–"কারণ, সে অপর ব্যক্তিকে বধ করিতে চাহিয়াছিল। তাহার বধ করিবার ক্ষমতা থাকিলে সে তাহাকে বধ করিয়া ফেলিত।" অপর এক প্রমাণ এই যে, কোন ধনী লোক শরীয়তের বিধান লংঘনপূর্বক অন্যায়ভাবে অপব্যয় করিতেছ দেখিয়া যদি কোন দরিদ্র লোক ধন পাইলে তদ্রূপ অন্যায়ভাবে অপব্যয় করিবার ইচ্ছা করে তবে উভয়েই সমান পাপী হইবে। পূর্বোক্ত নিহত ব্যক্তি এবং এই দরিদ্র লোকটির পাপ কেবল আন্তরিক ইচ্ছার জন্যই হইবে।

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, কোন ব্যক্তি নিজ বিছানায় এক মহিলা পাইয়া পরনারী জ্ঞানে সম্ভোগ করিবার পর জানিতে পারিল যে, সে পরনারী নহে–নিজেরই বিবাহিত স্ত্রী; তথাপি সেই ব্যক্তি পাপী হইবে। তদ্রূপ যে-ব্যক্তির ওযু নাই, অথচ সে জানে যে তাহার ওযু আছে, এমতাবস্থায় নামায পড়িলে সে নামাযের সওয়াব পাইবে। পক্ষান্তরে যাহার ওযু আছে, অথচ সেই মনে করিতেছে যে, তাহার ওযু নাই, এমতাবস্থায় যদি সে নামায পড়ে এবং নামাযান্তে ওযু আছে বলিয়া স্মরণও হয় তথাপি সে পাপী হইবে। হৃদয়ের অবস্থার কারণেই এইরূপ হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তি পাপের ইচ্ছা করিবার পর আল্লাহ্‌র ভয়ে ইহা হইতে ক্ষান্ত থাকিলে তাহার আমলনামায় পুণ্য লিপিবদ্ধ হয়। কারণ, হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে যে, মানুষের ইচ্ছা তাহার স্বভাবের অনুরূপ হয় এবং প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করাকে মুজাহাদা বলে। হৃদয়কে মলিন করিতে অন্যায় অভিলাষের যে পরিমাণ ক্ষমতা আছে, ইহাকে উজ্জ্বল করিতে মুজাহাদার তদপেক্ষা অধিক ক্ষমতা আছে। ইহাই অভিলষিত পাপ হইতে বিরত থাকিলে মানুষের আমলনামায় পুণ্য লেখার অর্থ এবং উহাই উক্ত হাদীসের উদ্দেশ্য। কোন ব্যক্তি পাপ কার্যের অভিলাষ করিয়া অক্ষমতা বশত ইহা করিতে না পারিলে অভিলাষে যে-পাপ হয়, অক্ষমতাজনিত পাপ হইতে বিরতির দরুন উক্ত পাপ মোচন হয় না এবং যে-মলিনতা তাহার আত্মার উপর পড়ে তাহা বিদূরিত হয় না ও তদ্রূপ অভিলাষের জন্য সে দায়ী হয়। ইহার দৃষ্টান্ত পূর্বোক্ত দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিহত ব্যক্তি। সে অক্ষমতা বশত প্রতিপক্ষকে হত্যা করিতে না পারিয়া নিজে নিহত হইলেও পাপী হইবে।

নিয়তের কারণে কার্য-ফলের পরিবর্তন–মানুষের কার্য তিন প্রকার; যথা ঃ- (১) পাপ, (২) ইবাদত ও (৩) মুবাহ অর্থাৎ যাহা ক্ষতিকর নহে এবং হিতকরও নহে।

পাপ– রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যে বলিয়াছেন–

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ –

(নিয়ত অনুরূপই কার্যফল পাওয়া যায়) ইহাতে যদি কেহ মনে করে যে, পাপ কার্যও সদুদ্দেশ্যের ফলে পুণ্য-কার্যে পরিববর্তিত হয় তবে মস্ত বড় ভুল করা হইবে। পাপ-কার্য এমন জঘন্য যে, উৎকৃষ্ট নিয়ত ইহার কোন পরিবর্তন ঘটাইতে পারে না। আর মন্দ অভিপ্রায়ে পাপ কার্য করিলে ইহা আরও জঘন্যতম হইয়া উঠে। ইহার দৃষ্টান্ত এইরূপ–যেমন, একজনের মনস্তুষ্টির জন্য অপরের নিন্দা করিয়া অথবা হারাম ধন দ্বারা মসজিদ, পুল, মাদরাসা নির্মাণ করত ধারণা করা যে, আমার উদ্দেশ্য মহৎ। যে-ব্যক্তি এবংবিধ কাজ করে সে জানে না যে, মন্দ কার্যে ভাল নিয়ত করাও অপর একটি মন্দ কার্য। এই মন্দকে মন্দ জানিয়া করিলেও সে ফাসিক এবং উৎকৃষ্ট জ্ঞানে করিলেও ফাসিক। কেননা ইলম শিক্ষা করা প্রত্যেকের জন্যই ফরয। অধিকাংশ স্থলে অজ্ঞানতাই মানবের ধ্বংসের কারণ। এইজন্য হযরত সহল তস্তরী (র) বলেন–"অজ্ঞানতা অপেক্ষা বড় পাপ আর নাই; আবার নিজের অজ্ঞানতা বুঝিতে না পারা তদপেক্ষা গুরুতর পাপ।" ইহার কারণ এই যে, নিজের অজ্ঞানতা বুঝিতে না পারিলে কেহই শিক্ষা করে না। অতএব অজ্ঞানতা তাহার সৌভাগ্যের পথে বিষম প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়।

তদ্রূপ বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত ও ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির সম্পাদক হইয়া ইয়াতীমদের ধনরক্ষকের দায়িত্ব লইয়া সরকারের নিকট হইতে অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে এবং নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন ও তর্কবিতর্কে জয়ী হওয়ার জন্য যে-সমস্ত ছাত্র বিদ্যাশিক্ষা করে, তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হারাম। এরূপ স্থলে শিক্ষক যদি বলেন–"আমি শরীয়তের ইলম সর্বত্র বিস্তার করিবার উদ্দেশ্যে শিক্ষা দান করিতেছি। শিক্ষার্থী যদি অর্জিত ইলম মন্দ কার্যে প্রয়োগ করত উহার অপব্যবহার করে, তবে করিবে, ইহাতে আমার কি? আমি ত সদুদ্দেশ্যের কল্যাণে পুণ্য পাইব।" শিক্ষকের এইরূপ উক্তি অজ্ঞানতা বৈ আর কিছুই নহে। যে-ব্যক্তি ডাকাতকে তলওয়ার ও মদ্য প্রস্তুতকারীকে আংগুর দিয়া বলে যে, দানের উদ্দেশ্যে আমি উহা বিতরণ করিয়াছি এবং যে-শিক্ষক তদ্রূপ অপাত্রে শিক্ষাদান করে, এই উভয় ক্ষেত্রেই দান নিতান্ত মূর্খতার কার্য। তলওয়ারধারী ব্যক্তিকে ডাকাত বলিয়া জানিতে পারিলে তাহার নিজস্ব তলওয়ার কাড়িয়া লওয়া কর্তব্য। এমতাবস্থায় তাহাকে অপর একটি তলওয়ার দান করা কিরূপে সঙ্গত হইবে? পর্ববর্তী বুযুর্গগণ দুনিয়াশীল আলিমের ক্ষতি হইতে রক্ষা পাইবার

জন্য আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেন এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাপের চিহ্ন দেখিতে পাইলে তাহাদিগকে শিক্ষা না দিয়া তাড়াইয়া দিতেন। হযরত ইমাম হাম্বল (র) তাঁহার এক পুরাতন ছাত্রকে সামান্য কারণে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। সেই ছাত্র নিজে গৃহের দেওয়ালের বাহির পৃষ্ঠে পলস্তারা করিয়াছিল। ইমাম সাহেব (র) বলিলেন–"দেওয়ালে লেপ দিয়া তুমি মুসলমানদের সদর রাস্তার পরিসর অন্যায়ভাবে নখ-পরিমাণ কমাইয়া দিয়াছ। অতএব চলিয়া যাও, তোমাকে শিক্ষা দেওয়া উচিত নহে।"

মোটের উপর কথা এই যে, সৎ উদ্দেশ্যে পাপ কার্য করিলে উহা কখনও পুণ্য কার্যে পরিণত হয় না। বরং যাহা শরীয়তে আদেশ করা হইয়াছে, তাহাই পুণ্য কার্য।

ইবাদত– ইবাদতের উপর নিয়ত (সদুদ্দেশ্য) দুই প্রকার ক্রিয়া করে। প্রথমত, নিয়তের কারণেই মূল ইবাদত শুদ্ধ হয়। দ্বিতীয়ত, কোন ইবাদতের সদুদ্দেশ্য যত অধিক প্রবিষ্ট থাকে, সওয়াবও তত বৃদ্ধি পায়। নিয়ত কিভাবে করিলে অধিক সওয়াব পাওয়া যায়, ইহা যে-ব্যক্তি শিক্ষা করিয়াছে, সে এক কার্যে দশ প্রকার সদুদ্দেশ্য সৃজনপূর্বক উহাকে দশ প্রকার ইবাদতের সমান করিয়া লইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে কর, কোন ব্যক্তি মসজিদে ই'তিকাফে বসিলে ইহাতে বহু প্রকার নিয়ত থাকিতে পারে। প্রথম, আল্লাহ্‌র দর্শন লাভের আশা। কেননা, মসজিদ আল্লাহ্‌র ঘর; অতএব যে-ব্যক্তি মসজিদে যায়, সে আল্লাহ্‌র দর্শন লাভের জন্যই যাইয়া থাকে; যেমন রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–" যে ব্যক্তি মসজিদে গমন করে, সে আল্লাহ্‌কে দর্শন করিতে যায় এবং যে-ব্যক্তি কাহারও দর্শন লাভে যায়, দর্শকের আতিথ্য করা তাহার (গৃহস্বামীর) পক্ষে প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে।" দ্বিতীয়, পরবর্তী নামাযের প্রতীক্ষা। হাদীস শরীফে আছে, যে-ব্যক্তি নামাযের প্রতীক্ষায় থাকে, সে যেন নামাযেই লিপ্ত থাকে। (অর্থাৎ সেই ব্যক্তি নামাযে লিপ্ত থাকার তুল্য সওয়াব পায়।) তৃতীয়, মসজিদে অবস্থান দ্বারা চক্ষু, কর্ণ, রসনা, হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে অন্যায় ও নিরর্থক সঞ্চালন হইতে বিরত রাখা। ইহা এক প্রকার রোযা। কারণ, হাদীস শরীফে আছে যে, রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"মসজিদে উপবেশন আমার উম্মতের পক্ষে রাহ্‌বানিয়াত (সংসার-বিরাগ।)" চুতর্থ, সাংসারিক সকল কাজকারবার পরিত্যাগ করত

নিজকে আল্লাহ্‌র নিকট সমর্পণ করিয়া দেওয়া এবং একমাত্র যিকির, ধ্যান-ধারণা ও মুনাজাতে নিমগ্ন থাকা। পঞ্চম, লোকের সহিত মেলামেশা ও তাহাদের অনিষ্টকারিতা হইতে আত্মরক্ষা করা। ষষ্ঠ, মসজিদের মধ্যে মন্দ কাজ দেখিলে নিষেধ করা, উৎকৃষ্ট কার্য দেখিলে আদেশ করা এবং কেহ ভালরূপে নামায পড়িতে না জানিলে তাহাকে শিক্ষা দেওয়া। সপ্তম, মসজিদ ধর্মপরায়ণ লোকের শান্তির স্থান বলিয়া আল্লাহ্‌র কোন প্রিয় বান্দা আগমন করিলে তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের সুযোগ লাভ করা। অষ্টম, আল্লাহ্‌র ঘরে পাপকার্য বা পাপকার্যের চিন্তা করিতে লজ্জা আসিবে, এই নিয়তে ই'তিকাফ করা। এই একটি উদাহরণ হইতে অন্যান্য সকল ইবাদতের সম্বন্ধে অনুধাবন করিয়া দেখ। প্রত্যেক ইবাদত কার্যেই উক্ত প্রকার বহু নিয়ত করা যাইতে পারে এবং যে-ব্যক্তি এক কার্যে যত অধিক সদুদ্দেশ্য সংযোগ করিতে পারে, সে তাহা হইতে তত অধিক সওয়াব লাভ করে।

মুবাহ্–যে-কার্যে পাপও নাই, পুণ্যও নাই তাহাই মুবাহ্। পশুর ন্যায় উদাসীনভাবে এই শ্রেণীর কার্য করা কাহারও উচিত নহে। ভাল নিয়ত সংযোগ করত এই শ্রেণীর কার্য করিতে পারিলে ইহা হইতেও বহু সওয়াব পাওয়া যায়। এমতাবস্থায় পশুর ন্যায় অন্যমনস্কভাবে এই সকল কার্য করিয়া যাওয়া মানুষের পক্ষে বিষম ক্ষতির কথা। কেননা, মানুষের প্রত্যেক গতি ও স্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করা হইবে এবং মুবাহ্ কার্যেরও হিসাব লওয়া হইবে; যদি মন্দ উদ্দেশ্যে করা হয় তবে তজ্জন্য শাস্তি দেওয়া হইবে এবং সদুদ্দেশ্যে করিয়া থাকিলে সওয়াব দেওয়া হইবে। কিন্তু কোনই উদ্দেশ্য না রাখিয়া পশুর ন্যায় অন্যমনস্কভাবে করিলে অমূল্য পরমায়ুর যে-অংশ সেই কার্যে ব্যয় হয়, তাহা বৃথা অপচয় হয় বলিয়া ইহা মানবের পক্ষে কেবল ক্ষতিই ক্ষতি।

আল্লাহ্ বলেন ঃ – وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

অর্থাৎ "ইহলোক হইতে তোমাদের নিজের অংশ (লইতে) ভুলিও না।" (সূরা-কাসাস, ৮ রুকূ ২০ পারা।) সদুদ্দেশ্য ব্যতীত মুবাহ্ কার্য করিলে আল্লাহ্ তা'আলার এই নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। দুনিয়া অতি দ্রুতবেগে চলিয়া যাইতেছে। অতএব, যতদূর সম্ভব পুণ্য সঞ্চয় করিয়া লওয়া উচিত। ইহা চিরকাল সঙ্গে থাকিবে। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"বান্দা পৃথিবীতে যে-সমস্ত কার্য করে, ইহাদের প্রত্যেকটি সম্বন্ধেই

তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে। এমন কি যে-সুরমা সে চক্ষে ব্যবহার করিয়াছে, মাটির ছোট ঢেলা যাহা সে হাতে ঘসিয়া ফেলিয়াছে বা যে-হস্ত কোন ভ্রাতার বস্ত্র স্পর্শ করিয়াছে, তৎসমুদয় সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসা করা হইবে।"

সদুদ্দেশ্যে কিরূপে মুবাহ্ কার্য করা যাইতে পারে, এই জ্ঞানও একটি শ্রেষ্ঠ ইলম এবং প্রত্যেকেরই ইহা শিক্ষা করা আবশ্যক। মুবাহ্ কার্য নিয়তের দোষে কিরূপে পাপে পরিণত হয় আবার নিয়তের গুণে ইহাই কেমন সওয়াবের কার্যে পরিগণিত হয়, একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে। যে সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করে এবং তাহার উদ্দেশ্য থাকে, স্বীয় ঐশ্বর্য প্রকাশ করত আত্মগর্ব করা বা শারীরিক পরিষ্কার-পচ্ছিন্নতা ও সৌখিনতার পরিচয় দেওয়া অথবা মন্দ অভিপ্রায়ে পর-নারীকে নিজের দিকে আকর্ষণ করা। পক্ষান্তরে সুগন্ধি দ্রব্য এইরূপ সদুদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাইতে পারে–আল্লাহ্র ঘর অর্থাৎ মসজিদের সম্মান প্রদর্শনার্থ আমি সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করিতেছি; নিজ শরীরে সুগন্ধ লাগাইলে পার্শ্ববর্তী লোকেও শান্তি পাইবে এবং তাহাদের মন প্রফুল্ল হইবে, সুগন্ধি ব্যবহার করত নিজ দেহের দুর্গন্ধ দূর করিতেছি যেন ইহাতে অপরের কষ্ট না হয় এবং লোকে আমার গীবত করিয়া পাপী না হয়। সুগন্ধি ব্যবহার করিয়া মস্তিষ্কের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতেছি যেন ইহা নির্মল হইয়া আল্লাহ্র যিকির ও ধ্যান-ধারণায় অধিকতর শক্তিশালী হইয়া ওঠে। যাহাদের মনে পুণ্যলাভের ইচ্ছা প্রবল থাকে কেবল তাহারাই প্রত্যেক মুবাহ্ কার্যে তদ্রূপ সদুদ্দেশ্য মনে জাগাইয়া লইতে পারে এবং তাহাদের প্রতিটি নিয়তই আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়স্বরূপ হইয়া থাকে। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের এই অবস্থাই ছিল। এমনকি, তাঁহারা আহার করা, পায়খানায় যাওয়া এবং স্ত্রীসম্ভোগ করাও সদুদ্দেশ্যে সম্পন্ন করত সর্বদা পুণ্য অর্জন করিয়া গিয়াছেন। মানুষ সৎকার্যের নিয়ত করিলেই সওয়াব পাইয়া থাকে। স্ত্রীসহবাসকালে এইরূপ নিয়ত করিলেও সওয়াব পাওয়া যায়; যথা–সন্তান জন্মিলে রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উম্মতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে; স্বীয় পত্নী আনন্দানুভব করিবে এবং তাহাকে ও নিজকে পাপ হইতে রক্ষার উপায় হইবে।

হযরত সুফিয়ান সাওরী (র) একদা উলটা জামা পরিধান করিলেন। লোকে উহা দেখিয়া নিবেদন করিল–"আপনি বাহু প্রসারিত করুন; তাহা হইলে আমরা জামাটি সোজা করিয়া দিব।" তিনি ইহা শুনিয়া স্বীয় বাহু আরও সঙ্কুচিত করিয়া লইলেন এবং বলিলেন–"আমি এই উলটা বস্ত্র আল্লাহ্র জন্য পরিধান করিয়াছি

এবং তাঁহার জন্যই সোজা করিয়া লইব।" হযরত যাকারিয়া আলায়হিস সালাম কোন স্থানে মজুরি করিতে গিয়াছিলেন। ক্ষুধার্ত অবস্থায় তিনি আহারে প্রবৃত্ত হইলে কয়েকজন লোক আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। তিনি তাহাদিগকে আহার করিতে আহবান না করিয়া নিজে আহার সমাধা করিলেন এবং বলিলেন–"সমস্ত খাদ্য না খাইলে আমা দ্বারা পূর্ণ পরিশ্রম হইত না, কাজ করিতে যাইয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িতাম এবং যে কাজ করা আমার উপর ফরয ছিল, বাহাদুরি ও দানের কারণে তাহা সমাধা করিতে পারিতাম না।" হযরত সুফিয়ান (র) আহার করিতেছিলেন; এমন সময় এক ব্যক্তি যাইয়া তথায় উপস্থিত হইল। তিনি তাহাকে আহার করিতে আহ্বান না করিয়া নিজের আহার শেষ করত বলিলেন–"এই খাদ্য ধারে সংগ্রহ হইয়া না থাকিলে তোমাকে নিশ্চয়ই খাইতে বলিতাম।" অবশেষে তিনি বলিলেন–" আহারের জন্য কাহাকেও অনুরোধ করিয়া আহার দানকালে যদি মনে ভার বোধ হয় এবং অনুরুদ্ধ ব্যক্তি আহার না করে তবে অনুরোধকারী কপটতার দোষে পাপী হইবে। কিন্তু সেই ব্যক্তি আহার করিলে অনুরোধকারী কপটতা ও খেয়ানতজনিত পাপে পাপী হইবে। কারণ, তাহার যে খাওয়াইবার ইচ্ছা নাই, এই কথা জানিলে সে কখনও খাইত না।"

প্রকৃত ও মৌখিক নিয়ত–সোজা সরল লোকে যখন শুনে যে, মুবাহ্ কার্য উৎকৃষ্ট নিয়তে করা যায় তখন তাহারা হয়ত অন্তরে বা মুখে বলে–"আল্লাহ্র জন্য আমি বিবাহ করিতেছি; আল্লাহ্র জন্য আহার করিতেছি বা আল্লাহ্র জন্য শিক্ষা দান করিয়া থাকি।" এই প্রকার কথা বলিয়া তাহারা বিবেচনা করে যে, মনে বা মুখে এইরূপ বলাকেই নিয়ত বলে। কিন্তু মন বা মুখের এইরূপ কথাকে নিয়ত বলে না। প্রকৃত নিয়ত এমন এক আকর্ষণ ও প্রবল আকাঙ্ক্ষা যে, তাহা হৃদয়ে উৎপন্ন হইয়া মানুষকে দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত কার্যে লাগাইয়া রাখে। উহা যেন যাচঞাকারীর করুণ আর্তনাদ ; শরীর এই আর্তনাদে অস্থির হইয়া তদনুসারে কাজে প্রবৃত্ত হয়। মনের এই অবস্থা সর্বদা থাকে না। কর্মের উদ্দেশ্য যখন সুস্পষ্ট ও বলবান হইয়া উঠে কেবল তখনই এই অবস্থার উদ্ভব হইয়া থাকে। যে নিয়ত মনকে তদ্রূপ আকৃষ্ট ও উদ্দীপ্ত করিতে পারে না, তাহাকে মৌখিক নিয়ত বলে।

মৌখিক নিয়তের দৃষ্টান্ত এইরূপ–মনে কর, এক ব্যক্তির উদর পূর্ণ আছে অথচ সে বলে–'আমি ক্ষুধার্ত থাকিবার নিয়ত করিলাম।" অথবা কোন উদাসীন

ব্যক্তি বলে–'আমি অমুকের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের আশা রাখি।' অথচ ইহা তাহার পক্ষে অসম্ভব কথা। এইরূপ যে-ব্যক্তি কামবাসনায় উত্তেজিত হইয়া স্ত্রীসম্ভোগ করিতেছে, সে যদি বলে–"আমি সন্তান কামনায় ইহা করিতেছি।' তবে ইহা বেহুদা কথা হইবে। এইরূপ যে-ব্যক্তি কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে পাণি গ্রহণ করে, সে যদি বলে–'আমি সুন্নত পালনার্থে বিবাহ করিতেছি।' তবে তাহার কথাও বেহুদা হইবে। শুধু মৌখিক উক্তি বা প্রবৃত্তির অভিলাষে প্রকৃত নিয়ত হৃদয়ে উদ্ভব হয় না। প্রথমে শরীয়তের বিধানের প্রতি ঈমান খুব মযবুত হওয়া আবশ্যক। সন্তান-কামনায় বিবাহ করিলে যেরূপ পুণ্য পাওয়া যায়, তদ্বিষয়ে যে-সকল হাদীস বর্ণিত আছে, তাহা বিশেষ মনোযোগের সহিত বুঝিয়া লওয়া উচিত। এইরূপে বিবাহজনিত পুণ্য ও কল্যাণ লাভের আশায় প্রলুব্ধ হইয়া বিবাহ করিলে মুখে না বলিলেও এমন বিবাহ সুন্নত পালনের জন্য হইবে। এইরূপ আল্লাহ্‌র আদেশ পালনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা যাহাকে নামাযে প্রবৃত্ত করে তাহার পক্ষে 'আল্লাহ্‌র আদেশ পালনার্থে নামায পড়িতেছি', এমন উক্তি করা নিরর্থক। এরূপ নিরর্থক উক্তিকারী এমন ব্যক্তিতুল্য যে ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া আহারে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং মুখে বলিতেছে–'ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য আমি আহার করিতেছি।' তাহার পক্ষে এই উক্তি নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন। কেননা, সে যখন ক্ষুধার্ত তখন তাহার আহার কেবল ক্ষুধা নিবারণের জন্যই হইয়া থাকে। প্রবৃত্তি যেখানে আনন্দ লাভের আশায় উদ্দীপ্ত সেখানে পারলৌকিক মঙ্গল প্রাপ্তির নিয়ত করা বড় দুঃসাধ্য। তবে পরকালের পুণ্যপ্রাপ্তির আশা অত্যন্ত প্রবল থাকিলে ইহা সহজ হইয়া পড়ে।

নিয়তের উপর মানবের অক্ষমতা–এই পর্যন্ত বলার উদ্দেশ্য এই যে, নিয়ত মানবের আয়ত্তে নহে। কারণ, যে-প্রবল ইচ্ছা মানুষকে কার্যে রত রাখে তাহাকেই নিয়ত বলে। কার্য অবশ্যই তাহার ক্ষমতাক্রমে সম্পন্ন হয়। সে মনে করিলে হস্তপদাদি সঞ্চালনে কাজ করিতে পারে; আবার নাও করিতে পারে। কিন্তু ইচ্ছাটি তাহার ক্ষমতার মধ্যে নহে। সে মনে করিলেই ইচ্ছা হৃদয়ে উৎপন্ন করিতে পারে না, আবার ইচ্ছা উদয় হইলে ইহাকে বাধাও দিতে পারে না। কোন কোন সময় এমন হয় যে, প্রবৃত্তি কিছু চাহিতে থাকিলেও তখন ইচ্ছা হয় না, আবার অন্য সময়ে প্রবৃত্তি না চাহিলেও সেই বিষয়ে ইচ্ছা জন্মে।

ইচ্ছার উৎপত্তি–ধ্রুব বিশ্বাস হইতে ইচ্ছার উদ্ভব হয়। যে-ব্যক্তি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিয়া লইয়াছে যে, ইহকালে বা পরকালে তাহার গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য

রহিয়াছে, সে সেই উদ্দেশ্য সাধনে চিরকাল আশাধারী হইয়া থাকে। যে-ব্যক্তি এই বিষয়ে সূক্ষ্ম তত্ত্ব অবগত হইয়াছে, সে বিশুদ্ধ নিয়তের অভাবে বহু সৎকার্য হইতে বিরত থাকে। হযরত ইব্‌নে সিরীন (র) হযরত হাসান বসরীর (র) জানাযার নামায পড়ে নাই এবং বলেন–"আমার অন্তরে জানাযার নামাযে উপস্থিত হইবার ইচ্ছা খুঁজিয়া পাই নাই।" কুফার প্রখ্যাত আলিম হযরত জামাদ ইব্‌নে সুলায়মানের (র) জানাযার নামাযে হযরত সুফিয়ান সাওরী (র) যোগদান করেন নাই। লোকে ইহার কারণ জিজ্ঞসা করিলে তিনি বলিলেন–"ইচ্ছা হইলে অবশ্যই জানাযার নামায পড়িতাম।" এক ব্যক্তি দু'আ করিবার জন্য হযরত তাউসকে (র) অনুরোধ করিল। তিনি উত্তরে বলিলেন–" যে-পর্যন্ত আমার হৃদয়ে দু'আ করিবার ইচ্ছা আবির্ভূত না হয় সেই পর্যন্ত প্রতীক্ষা কর।" লোকে তাঁহাকে হাদীস বর্ণনা করিতে অনুরোধ করিলে কখন কখন তিনি বর্ণনা করিতেন না; আবার কোন কোন বিনা অনুরোধে বর্ণনা করিতেন এবং ইহার কারণস্বরূপ বলিতেন– "আমি নিয়তের প্রতীক্ষায় থাকি।" এক বুযুর্গ বলেন–"কোন একজন পীড়িত ব্যক্তিকে দেখিতে যাইবার নিয়ত বিশুদ্ধ করিতে আমি এক মাস যাবত চেষ্টা করিতেছি, অদ্যাবধি নিয়ত বিশুদ্ধ হয় নাই।"

মোটের উপর কথা এই যে, যে-পর্যন্ত সংসারের লোভ হৃদয়ে প্রবল থাকে, সেই পর্যন্ত কোন ইবাদতে নিয়ত ঠিক হয় না; এমনকি তখন ফরয কার্যের নিয়তও বহু কষ্টে ঠিক করিতে হয়। কখন কখন এমন হয় যে, দোযখের শাস্তির ভয় না আনিলে নিয়ত ঠিক হয় না। এই বিষয়ে যে-ব্যক্তি পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনি কোন কোন সময় সওয়াবের কার্য পরিত্যাগ করত মুবাহ্ কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। কেননা, মুবাহ্ কার্যে তিনি বিশুদ্ধ নিয়ত দেখিতে পান। যেমন, কোন ব্যক্তি প্রতিশোধ গ্রহণ ব্যাপারে সদুদ্দেশ্য দেখিতে পান; কিন্তু ক্ষমা করিতে তদ্রূপ নিয়ত দেখিতে পান না। এমন স্থলে ক্ষমা অপেক্ষা প্রতিশোধ গ্রহণই উৎকৃষ্ট। কেহ কেহ হয়ত তাহাজ্জুদ নামায পড়ার সুষ্ঠু নিয়ত স্বীয় অন্তরে খুঁজিয়া পান না; কিন্তু নিদ্রা যাওয়ার উৎকৃষ্ট সংকল্প দেখিতে পান যে, তাহা হইলে অতি প্রত্যুষে উঠিয়া ফজরের নামায পড়া যাইবে। এমন ব্যক্তির পক্ষে তাহাজ্জুদ না পড়িয়া নিদ্রা যাওয়াই উত্তম। যে-ব্যক্তি ইবাদত করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তিনি যদি বুঝিতে পারেন যে, পত্নীর সহিত কিছুক্ষণ আমোদপ্রমোদ করিলে বা অন্যের সহিত আলাপ করিলে মনের বিমর্ষতা ও

শরীরের ক্লান্তি দূর হইতে এবং অবশেষে পুনরায় ইবাদতে আনন্দ, উৎসাহ ও একাগ্রতা বৃদ্ধি পাইবে, তবে এই নিয়তে তাঁহার পক্ষে আমোদ-প্রমোদ ও বাক্যালাপ করা একাগ্রতাহীন ইবাদত অপেক্ষা উত্তম।

হযরত আবূ দরদা রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন–"আল্লাহ্র ইবাদতে প্রফুল্লতা ও আনন্দ লাভের উদ্দেশ্যে আমি কোন কোন সময় নির্দোষ আমোদ-প্রমোদ উপভোগ করি।" হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন–"এক কার্যে যদি সর্বদা তোমার মনকে বলপূর্বক নিযুক্ত রাখ তবে তোমার আত্মা অন্ধ হইয়া পড়িবে।" এই ব্যবহারকে জ্বরের রোগীর জন্য গোশ্ত পথ্য দেওয়ার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। অভিজ্ঞ চিকিৎসক রোগীর বল ফিরাইয়া আনিয়া ঔষধ গ্রহণের শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তাহাকে গোশ্ত খাওয়াইয়া থাকে। কেহ হয়ত শত্রুগণকে পশ্চাৎ দিক হইতে অতর্কিত আক্রমণের উদ্দেশ্যে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করে। সুচতুর সেনাপতিগণ এইরূপ বহু কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। মানবকে প্রবৃত্তি ও শয়তানের সহিত অবিশ্রান্ত যুদ্ধ ও তর্কবিতর্ক করিয়া ধর্মপথে চলিতে হয়। এই পথেও চালাকি এবং কৌশল নিতান্ত আবশ্যক। বুযুর্গগণ উহা পছন্দ করেন। অবশ্য অপরিপক্ক আলিমগণ এই পথের সন্ধান জানে না।

ইবাদতের ত্রিবিধ উদ্দেশ্য–ইতঃপূর্বে বলা হইয়াছে, যে-মানসিক উদ্দীপনার প্রভাবে মানব কার্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে নিয়ত বলে। ইবাদতের নিয়ত তিন প্রকার হইয়া থাকে। কেহ কেহ দোযখের ভয়ে শঙ্কিত হইয়া ইবাদত করে। আবার কোন কোন লোক বেহেশ্ত পাইবার লোভে ইবাদতে রত হয়। যে-ব্যক্তি বেহেশ্ত লাভের আশায় ইবাদত করে, সে ভোজন-লালসা ও কামপ্রবৃত্তির দাস। কারণ, সেই ব্যক্তি এমন স্থানে যাইবার চেষ্টা করিতেছে, যথায় ভোজন-লালসা ও কামনাবাসনা চরিতার্থ হইবে। পক্ষান্তরে যে-ব্যক্তি দোযখের ভয়ে ইবাদত করে, সে দুষ্ট ভৃত্যতুল্য; লাঠি হাতে লইয়া না ধমকাইলে সে কাজ করে না। এই দুই ব্যক্তি আল্লাহ্র কোন আবশ্যকতা অনুভব করে না। আল্লাহ্র প্রকৃত বান্দা কেবল আল্লাহ্র জন্য সমস্ত কাজ করিয়া থাকেন–বেহেশ্তের লোভ বা দোযখের ভয়ে কোন কাজ করেন না। তাঁহার অবস্থা প্রেমোন্মত্ত ব্যক্তিসদৃশ। প্রেমোন্মত্ত ব্যক্তি যেমন প্রেমাস্পদের মুখের দিকে চাহিয়া পড়িয়া থাকে–তাহার নিকট স্বর্ণ-রৌপ্য চায় না, আল্লাহ্র প্রকৃত বান্দাও তদ্রূপ তাঁহার অপার সৌন্দর্যের দিকে চাহিয়া তাঁহার প্রিয় কার্য করিয়া চলেন। যে-প্রেমিক স্বর্ণ-রৌপ্য

পাইবার আশায় প্রেমাস্পদের দিকে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, বস্তুত স্বর্ণ-রৌপ্যই তাহার যথার্থ প্রেমাস্পদ। সুতরাং একমাত্র আল্লাহ্র সৌন্দর্য যাহার নিকট প্রিয়তম পদার্থ নহে, তাহার মনে প্রকৃত নিয়ত জন্মিতে পারে না। সৌভাগ্য ক্রমে যাহার মনে এই প্রকরে নিয়ত জন্মিয়াছে তাহার সমস্ত ইবাদত কেবল আল্লাহ্র স্মরণে, তাঁহার ধ্যান-ধারণায় ও তাঁহার নিকট মুনাজাতে প্রযুক্ত হয়। প্রেমাস্পদের আদেশ পালনও প্রিয় কার্য বলিয়াই এমন ব্যক্তি শারীরিক ইবাদত করিয়া থাকনে। তিনি স্বীয় দেহকেও কঠোর পরিশ্রমে নিয়োজিত রাখিতে চাহেন এবং সর্বশক্তি প্রয়োগে ইহাকে আল্লাহ্র ইবাদতের দিকে আকর্ষণ করিতে থাকেন। স্বীয় মনকে আল্লাহ্র অতুলনীয় সৌন্দর্যে বিভোর করিয়া রাখাই তাঁহার এইরূপ ইবাদতের উদ্দেশ্য। প্রবৃত্তির অনুসরণ করিলে আল্লাহ্র সৌন্দর্য দর্শনে এবং তাঁহার নিকট নিভৃত নিবেদনের আনন্দে বিঘ্ন ঘটে ও হৃদয়ের সম্মুখে বিষম পর্দা পড়িয়া যায়। এইজন্য তদ্রূপ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি সর্বদা পাপ হইতে বিরত থাকেন। বাস্তবপক্ষে এইরূপ ব্যক্তিই আরিফ (চক্ষুষ্মান)।

হযরত আহ্মদ ইব্নে খেযরুভিয়্যা (র) আল্লাহ্কে স্বপ্নে দেখিলেন যে তিনি বলিতেছেন–"সকলেই আমার নিকট হইতে কিছু চাহিয়া থাকে; কিন্তু আবূ ইয়াযীদ আমাকেই চাহে।" হযরত শিব্লীকে (র) লোকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল–'আল্লাহ্ আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন?" তিনি বলিলেন–"আল্লাহ্ আমাকে ভর্ৎসনা করিলেন। ইহার কারণ এই যে, একবার আমার মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল–"বেহেশ্ত হইতে বঞ্চিত হওয়া অপেক্ষা ক্ষতি আর কি হইতে পারে?" আল্লাহ্ বলিলেন –'ইহা ঠিক নহে; বরং আমার দর্শন হইতে বঞ্চিত হওয়া অপেক্ষা গুরুতর ক্ষতি আর কি হইবে।"

যাহা হউক, আল্লাহ্র দর্শনজনিত আনন্দের পরিচয়, ইনশাআল্লাহ্, পরিত্রাণ পুস্তকের 'মহব্বত' অধ্যায়ে দেওয়া হইবে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ–ইখ্লাস (আন্তরিকতা)

ইখলাসের ফযীলত–ইখ্লাসের ফযীলত বর্ণনা করিয়া আল্লাহ্ বলেন–

وَمَا أُمِرُوْا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ –

অর্থাৎ 'আল্লাহ্‌র জন্য ধর্মকে বিশুদ্ধ করিয়া একমাত্র তাঁহার ইবাদত করিবার জন্য মানুষকে আদেশ করা হইয়াছে।" (সূরা বাইয়্যেনাহ, ১ রুকূ, ৩০ পারা।)

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ أَلاَ لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ – অর্থাৎ "সাবধান হও! আল্লাহ্‌রই জন্য বিশুদ্ধ ধর্ম" (সূরা যুমর, ১ রুকূ, ৩০ পারা।) রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ বলেন–"আমার গুপ্ত তত্ত্বসমূহের মধ্যে ইখলাস একটি গুপ্ত তত্ত্ব। যাহাকে আমি ভালবাসি তাহার হৃদয়ে উহা জন্মইয়া দিয়া থাকি। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"হে মু'আয, ইখ্‌লাসের সহিত কাজ কর, তাহাতে অল্প কাজই তোমার জন্য যথেষ্ট হইবে।" বিনাশন খণ্ডের অষ্টম অধ্যায়ে রিয়ার নিন্দা ও অপকারিতা সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তৎসমুদয়ই ইখ্‌লাসের প্রশংসা। কেননা, রিয়া ইখ্‌লাস বিনষ্ট হওয়ার অন্যতম কারণ।

হযরত মা'রূপ কারখী (র) স্বীয় দেহে চাবুক মারিতেন এবং বলিতেন يَا نَفْسُ أَخْلِصِيْ تَخْلُصِيْ – অর্থাৎ "হে নফ্‌স, ইখ্‌লাস অবলম্বন কর, তাহা হইলে পরিত্রাণ পাইবে।" হযরত আবূ সুলায়মান (র) বলেন–"যে ব্যক্তি সমস্ত জীবনে একবারও ইখ্‌লাসের সহিত একমাত্র আল্লাহ্‌কে চাহিয়াছে সে সৌভাগ্যবান।" হযরত আবূ আইয়্যুব সেজেস্তানী (র) বলেন–নিয়তের মধ্যে ইখ্‌লাস রক্ষা করা মূল নিয়ত অপেক্ষা দুষ্কর।" এক ব্যক্তি জনৈক বুযুর্গকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল–"আল্লাহ্ আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন?" তিনি উত্তর করিলেন–"আমি যাহা কিছু আল্লাহর জন্য করিয়াছিলাম তৎসমুদয় আমার পুণ্যের পাল্লায় দেখিয়াছি। এমন কি একটি ডালিমের দানা যাহা রাস্তায় পতিত দেখিয়া কুড়াইয়া লইয়াছিলাম এবং একটি বিড়াল ঘরে মরিয়াছিল, এই দুইটিও পুণ্যের পাল্লায় দেখিয়াছি; আমার টুপীতে একটি রেশমের সূতা ছিল, ইহা পাপের পাল্লায় দেখিয়াছি। কিন্তু এক শত দীনার মূল্যে খরিদ-করা একট গর্দভ পুণ্যের পাল্লায় দেখিতে না পাইয়া আমি বলিলাম–"সুব্‌হানাল্লাহ্, বিড়ালটি ত পুণ্যের পাল্লায় দেখিতেছি কিন্তু গর্দভটি দেখিতেছি না!" উত্তর আসিল–'যেখানে তুমি পাঠাইয়াছ, তথায় পৌঁছিয়াছে। কারণ, গর্দভটি মরিয়াছে

শুনিয়া তুমি বলিয়াছিলে إِلَى لَعْنَتِ اللّٰهِ – (অর্থাৎ অধঃপাত হইল।) কিন্তু যদি বলিতে فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ – (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পথে গিয়াছে) তবে গর্দভটিকে পুণ্যের পাল্লায় দেখিতে পাইতে।' একবার আমি আল্লাহ্‌র জন্য দান করিলাম। সেই সময় কতিপয় লোক আমার দান দর্শন করিতেছিল। তাহারা দেখিতেছিল বলিয়া আমি আনন্দানুভব করিয়াছিলাম। এই দানে আমার মঙ্গল বা অমঙ্গল কিছুই হয় নাই" হযরত সুফিয়ান সাওরী (র) এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন–"তাহার সৌভাগ্য যে, সেই দান তাহার কোন অনিষ্ট করে নাই।"

এক ব্যক্তি বলেন–"আমি জাহাজে আরোহণপূর্বক জিহাদে যাইতে ছিলাম। আমাদের এক সাথী একটি মেষশাবক বিক্রয় করিতে উদ্যত হইলে আমি ভাবিলাম–'ইহা কিনিয়া কাজে লাগাই। অমুক শহরে যখন উপস্থিত হইব তখন বিক্রয় করিয়া ফেলিলে কিছু লাভও পাইব।" সেই রজনীতে আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে, দুই ব্যক্তি আকাশ হইতে অবতরণ করিল। তাহাদের একজন অপর জনকে বলিল– "ধর্মযোদ্ধাদের নাম লিপিবদ্ধ কর। আর ইহাও লিখিয়া লও যে, অমুক ব্যক্তি তামাশা দেখিতে, অমুকে বাণিজ্য উপলক্ষে এবং অমুকে গাযী বলিয়া সুখ্যাতি অর্জন করিতে আসিয়াছে।' তৎপর সেই ব্যক্তি আমার দিকে তাকাইয়া বলিল–'এই ব্যক্তি বাণিজ্য করিতে আসিয়াছে।" আমি বলিলাম–'আল্লাহ্‌র শপথ, আমার অবস্থা অবলোকন কর; আমার সহিত কোন পণ্যদ্রব্য নাই। আমি কিরূপে বাণিজ্য করিতে আসিলাম? আমি ত আল্লাহর জন্য আসিয়াছি।' সেই ব্যক্তি বলিল–"ওহে তুমি কি লাভ করিবার জন্য ঐ মেষশাবকটি খরিদ কর নাই?" ইহা শুনিয়া আমি রোদন করিতে করিতে বলিলাম–"আল্লাহ্‌র শপথ, আমি সওদাগর নহি।' তখন অপর ব্যক্তি বলিল–'ইহা লিখিয়া লও যে, অমুক ব্যক্তি জিহাদে আসিয়াছিল, কিন্তু পথে আসিয়া লাভের উদ্দেশ্যে একটি মেষশাবক কিনিয়া লইয়াছে। আল্লাহ্‌র যেরূপ ইচ্ছা তদ্রূপ তিনি আদেশ করিবেন।" এইজন্যই বুযুর্গগণ বলেন–"এক মুহূর্তের ইখ্‌লাসে মানব নাজাত পাইতে পারে; কিন্তু ইখ্‌লাস নিতান্ত দুর্লভ।" তাঁহারা আরও বলেন–"ইলম বীজ, আমল শস্যভূমি এবং ইখ্‌লাস পানিস্বরূপ।"

বানী ইসরাঈলে এক আবিদ ছিলেন। তিনি একদা শুনিতে পাইলেন, অমুক স্থানে একটি বৃক্ষ আছে, লোকে ইহাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতেছে। আবিদ

ক্রুদ্ধ হইয়া একটি কুঠার স্বীয় স্কন্ধে স্থাপনপূর্বক সেইবৃক্ষ কর্তনে ধাবিত হইলেন। পথিমধ্যে শয়তান এক বৃদ্ধের মূর্তি ধারণপূর্বক তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল–"তুমি কোথায় যাইতছে?" আবিদ বলিলেন– "অমুক বৃক্ষ কর্তন করিতে যাইতেছি।" শয়তান বলিল–"যাও, আল্লাহ্‌র ইবাদতে মগ্ন থাক। ইহা তোমার জন্য বৃক্ষ কর্তন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।" আবিদ বলিলেন–"আমি কখনও ফিরিয়া যাইব না। ইহাই আমার ইবাদত।" শয়তান বলিল–"আমি কখনও তোমাকে অগ্রসর হইতে দিব না।" ইহা বলিয়া সে আবিদের সহিত মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু আবিদ জয়ী হইয়া তাহাকে ভূতলে নিক্ষেপ করত বুকের উপর চড়িয়া বসিলেন। তখন শয়তান বলিল–"আমাকে ছাড়িয়া দাও। আমি তোমাকে একটি কথা বলিতেছি।" আবিদ ছাড়িয়া দিলে শয়তান বলিল–হে আবিদ, আল্লাহ্ দুনিয়াতে সহস্র সহস্র পয়গম্বর পাঠাইয়াছেন; এই বৃক্ষ কর্তন করা যদি তাঁহার অভিপ্রেত হইত তবে তিনি কোন পয়গম্বরকে আদেশ করিতেন। আর আল্লাহ্ তোমাকেও ইহা ছেদন করিতে আদেশ দেন নাই। সুতরাং বৃক্ষটি কর্তনে ক্ষান্ত হও।" আবিদ বলিলেন–"আমি বৃক্ষটি কাটিবই কাটিব।" শয়তান আবার বলিল– "আমি তোমাকে যাইতে দিব না।" তাহাদের মধ্যে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। আবিদ শয়তানকে পূর্বের ন্যায় পরাস্ত করিয়া তাহার বক্ষের উপর চড়িয়া বসিলেন। তখন শয়তান বলিল "আমাকে ছাড়িয়া দাও। আমি তোমাকে একটি কথা বলিতেছি। ইহা পছন্দ না হইলে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিও।" আবিদ তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। শয়তান বলিল–"হে আবিদ তুমি দরিদ্র, অন্যের সাহায্যে সংসার চালাইয়া থাক। বৃক্ষটি ছেদনে ক্ষান্ত হইলে যদি তোমার নিজের ব্যয় চালাইয়া অপর আবিদগণকেও দান করিবার পরিমাণ অর্থ পাও তবে ইহা তোমার পক্ষে বৃক্ষ কর্তন অপেক্ষা উত্তম। কারণ তুমি বৃক্ষটি কর্তন করিয়া ফেলিলে বৃক্ষ-পূজকগণের কোন ক্ষতি হইবে না; তাহারা অন্য একটি বৃক্ষ রোপন করিয়া লইবে। তোমার খামখেয়ালি পরিত্যাগ কর। তাহা হইলে প্রত্যহ সকালে তোমার বালিশের নিচে দুইটি করিয়া স্বর্ণমুদ্রা রাখিয়া যাইব।" আবিদ ইহা শুনিয়া মনে মনে ভাবিলেন–"এই বৃদ্ধ ত সত্য কথাই বলিতেছে। প্রত্যহ দুইটি স্বর্ণ মুদ্রা পাইলে একটি দরিদ্রের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিব এবং অপরটি নিজের সাংসারিক কাজে ব্যয় করিব। বৃক্ষ ছেদক অপেক্ষা ইহা উত্তম। তদুপরি এই বৃক্ষ কর্তনের জন্য আল্লাহ্ আমাকে আদেশও করেন নাই এবং আমি কোন পয়গম্বর নহি যে, আমার উপর বৃক্ষটি ছেদন করা

ওয়াজিব হইবে।" ফলকথা এই যে, এইরূপ চিন্তা করিয়া আবিদ আপন গৃহে ফিরিয়া গেলেন। প্রত্যুষে বালিশের নিচে দুইটি স্বর্ণ মুদ্রা দেখিয়া তিনি তুলিয়া লইলেন। দ্বিতীয় দিনও তদ্রূপ দুইট স্বর্ণমুদ্রা পাইয়া তিনি মনে মনে বলিলেন–'বৃক্ষটি কর্তন না করিয়া আমি উত্তম কাজ করিয়াছি।" কিন্তু তৃতীয় দিবস কিছুই না পাইয়া তিনি ক্রুদ্ধ হইলেন এবং আবার কুঠার হস্তে বৃক্ষ কর্তনে ধাবিত হইলেন। শয়তান পুনরায় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল–"কোথায় যাইতে চাহিতেছ?" আবিদ বলিলেন–"ঐ বৃক্ষটি ছেদন করিতে যাইতেছি।" শয়তান উত্তর দিল–"তুমি মিথ্যাবাদী। আল্লাহ্‌র শপথ, তুমি কখনও ঐ বৃক্ষ কাটিতে পারিবে না।" এমন সময় উভয়ের মধ্যে মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইল। এবার শয়তান আবিদকে পরাস্ত করিল। বাজের থাবা হইতে যেমন অন্য পাখির প্রাণরক্ষার কোন উপায় থাকে না শয়তানের হস্তেও নিরীহ আবিদের তদ্রূপ অবস্থা হইল। তখন শয়তান বলিল–"এখনও ফিরিয়া যাও; অন্যথায় ছাগলের ন্যায় তোমাকে যবেহ করিয়া ফেলিব।" আবিদ বলিলেন–"আচ্ছা, আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি ফিরিয়া যাইব। তবে বল দেখি দুইবার আমি কিরূপে তোমাকে পরাস্ত করিলাম এবং এবার কিরূপেই বা তুমি আমাকে পরাস্ত করিলে?" শয়তান বলিল "প্রথম দুইবার তুমি আল্লাহ্‌র জন্য ক্রুদ্ধ হইয়াছিলে এবং তিনি আমাকে তোমার নিকট পরাজিত করিয়া দিয়াছিলেন। কারণ, যে-ব্যক্তি ইখ্‌লাসের সহিত একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য কার্যে প্রবৃত্ত হয়, আমি তাহার উপর জয়ী হইতে পারি না। আর এবার তোমার নিজের স্বার্থে এবং আল্লাহ্‌র জন্য ক্রুদ্ধ হইয়াছ। যে-ব্যক্তি প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, সে আমার সহিত পারে না।"

ইখ্‌লাসের হাকীকত–ইতঃপূর্বে বলা হইয়াছে যে, নিয়তের কারণেই ইবাদত হইয়া থাকে এবং নিয়তই মানুষকে ইবাদতে প্রবৃত্ত করে। একটিমাত্র উদ্দেশ্য যখন ইবাদতে প্রবৃত্ত করে তখন এইরূপ নিয়তকে বিশুদ্ধ নিয়ত বলে। একাধিক উদ্দেশ্যে কার্য সম্পন্ন হইলে নিয়ত ভাগাভাগি হইয়া পড়ে এবং তখন ইহাকে বিশুদ্ধ নিয়ত বলা যায় না। একাধিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত কার্যের দৃষ্টান্ত এই– (১) এক ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জন্য রোযা রাখে, তৎসঙ্গে স্বাস্থ্যলাভের জন্য আহারে বিরত থাকাও তাহার উদ্দেশ্য থাকে। এই একই রোযার আরও উদ্দেশ্য থাকিতে পারে; যেমন–পরিবারিক ব্যয় কমানো, রন্ধনের পরিশ্রম হইতে অব্যাহতি লাভ; অপর কোন জরুরী কার্যে লিপ্ত থাকা অথবা অনাহারে নিদ্রা কম হইলে অধিক কাজ করিয়া লওয়া। (২) তদ্রূপ পুণ্য লাভের জন্য গোলাম আযাদ

করার সঙ্গে সঙ্গে গোলাম পোষণের ব্যয় ও তাহার মন্দ স্বভাব হইতে বাঁচিবার আশা করা। (৩) এইরূপ আল্লাহ্‌র আদেশ পালনার্থ হজ্বে গমন করা এবং তৎসঙ্গে আবহাওয়া পরিবর্তনে সুস্থ হইবার অভিলাষ, নানা দেশে-পর্যটনের অভিপ্রায় ও তামাশা দর্শনের বাসনা অথবা পরিবারিক কোন অশান্তি পরিহার পোষ্যবর্গের ভরণপোষণের চিন্তা হইতে মুক্তি বা কোন শত্রুর যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভের ইচ্ছা রাখা। (৪) সওয়াবের আশায় তাহাজ্জুদের নামায পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জাগ্রত থাকিয়া চোর হইতে ধনসম্পত্তি পাহারা দেওয়ার উদ্দেশ্য রাখা। (৫) আল্লাহ্‌র জন্য বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্যের সহিত অর্জিত বিদ্যার প্রভাবে অর্থোপার্জনের ইচ্ছা এবং সেই অর্থে ভূসম্পত্তি ক্রয়ের বাসনা ও সেই ভূমিতে সুন্দর উদ্যান নির্মাণের অভিলাষ অথবা লোকসমাজে বড় মানুষ বলিয়া সম্মানিত হইবার আকাঙ্ক্ষা করা। (৬) শিক্ষাদান কার্যে নির্বাক থাকার কষ্ট দূরীকরণ ও মনের প্রফুল্লতা অর্জনেরও আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা। (৭) তদ্রূপ কুরআন শরীফ লেখার মধ্যে হস্তাক্ষর সুন্দর ও পাকা করিবার উদ্দেশ্য রাখা। (৮) পদব্রজে হজ্বে গমনের উদ্দেশ্যের মধ্যে যানবাহনের ব্যয় বাঁচাইবার ইচ্ছা করা। (৯) ওযু করিবার উদ্দেশ্যের মধ্যে শরীর শীতল ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবার বাসনা থাকা। (১০) গোসলের প্রকৃত উদ্দেশ্যের সঙ্গে শরীরে দুর্গন্ধ দূরীকরণের ইচ্ছা থাকা। (১১) মসজিদে ই'তিকাফের উদ্দেশ্যের সঙ্গে ঘরভাড়া হইতে অব্যাহতির আশা রাখা। (১২) কোন ভিক্ষুককে দানের উদ্দেশ্যের সহিত তাহার খোশামোদ ও কাকুতি-মিনতি হইতে অব্যাহতি এবং দানে বিরত থাকিলে লোকলজ্জা হইতে নিষ্কৃতি-লাভের অভিলাষ করা। (১৩) লোক পীড়িত ব্যক্তিকে দেখিতে যাইবার উদ্দেশ্যের সঙ্গে এই ইচ্ছাও বিজড়িত করা যে, আমি পীড়িত হইলে লোকে আমাকে দেখিতে আসিবে অথবা লোকের নিন্দা ও তিরস্কার হইতে বাঁচিয়া থাকিবার আশা করা। (১৪) কোন সৎকার্য করিবার সময়ে এই আশা পোষণ করা যে, লোকে সৎ ও পুণ্যবান বলিয়া প্রসংশা করিবে। এবংবিধ উদ্দেশ্যে সৎকার্য করার নামই রিয়া। এই সম্বন্ধে ইতঃপূর্বে বলা হইয়াছে। (বিনাশনঃ শেষার্ধ, অষ্টম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।) ঐ প্রকার উদ্দেশ্য ধারণা অল্পই হউক বা অধিকই হউক, ইখ্‌লাস একেবারে বিনাশ করিয়া ফেলে।

নিঃস্বার্থভাবে কেবল আল্লাহত্ম উদ্দেশ্যে যে-কাজ সম্পন্ন হয় ইহাকেই বিশুদ্ধ সৎকার্য বলে। যেমন রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে ইখ্‌লাস সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন–

أَنْ تَقُوْلَ رَبِّىَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ – অর্থাৎ মনেপ্রাণে বলা যে, "আল্লাহ্ আমার প্রভু এবং তৎপর আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে যে আদেশ হইয়াছে তাহাতে দৃঢ়পদ থাকা।" মানব যে-পর্যন্ত স্বীয় প্রবৃত্তির অধীনতা হইতে মুক্ত না হইবে, সেই পর্যন্ত এই অবস্থা লাভ করা তাহার পক্ষে নিতান্ত দুষ্কর। এইজন্যই বুযুর্গগণ বলেন–"ইখ্‌লাসের ন্যায় কঠিন ও দুঃসাধ্য কাজ আর নাই। সমস্ত জীবনের মধ্যে একটি কাজও যদি ইখ্‌লাসের সহিত ঠিকভাবে করা যাইতে পারে তবেও মুক্তির আশা করা যায়।" বাস্তবিক কথা এই, গোবর এবং রক্তের মধ্য হইতে দুগ্ধ অবিকৃতভাবে নিঃসৃত করিয়া লওয়া যেমন দুষ্কর, প্রবৃত্তির স্পর্শে কলঙ্কিত হইতে না দিয়া কোন কার্য বিশুদ্ধভাবে আল্লাহ্‌র জন্য সম্পাদন করিয়া লওয়াও তদ্রূপ দুঃসাধ্য। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِيْنَ –

অর্থাৎ "তাহাদের (পশুগণের) উদরস্থ গোবর ও রক্তের মধ্য হইতে এমন দুগ্ধ বাহির করত তোমাদিগকে পান করাই যাহা বিশুদ্ধ ও পানকারীদের জন্য সহজে গলনালী মধ্যে প্রবেশ করে।" (সূরা নহল, ৯ রুকূ ১৪ পারা।)

ইখ্‌লাসের সহিত কার্য সম্পাদনের উপায়–সংসারের সকল আসক্তি ছিন্ন করত আল্লাহ্‌র মহব্বতে তন্ময় হইয়া প্রেমোন্মত্ত ব্যক্তির ন্যায় হইয়া পড়াই ইখ্‌লাসের সহিত কার্য সম্পদনের একমাত্র উপায়। কারণ প্রেমোন্মত্ত ব্যক্তি যাহা কিছু ইচ্ছা করে তৎসমুদয় তাহার প্রেমাস্পদের জন্যই করিয়া থাকে। যাহার অন্তরে আল্লাহ্-প্রেম প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, এমন ব্যক্তি আহার করিলে বা পায়খানায় গেলে তাহাও আল্লাহর জন্য ইখ্‌লাসের সহিত করিতে পারে। পক্ষান্তরে যাহার সংসারাসক্তি প্রবল, তাহার পক্ষে নামায-রোযাও ইখলাসের সহিত সম্পন্ন করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। কারণ, মানবের বাহ্য আচরণ তাহার অভ্যন্তরীণ স্বভাবের রূপ ধারণ করে। যে-দিকে তাহার মনের আকর্ষণ থাকে, সেই দিকেই সে ঝুঁকিয়া পড়ে। যাহার হৃদয়ে সম্মানের ভালবাসা প্রবল, তাহার সকল কার্য কেবল লোক-দেখানোর উদ্দেশ্যেই সংঘটিত হয়। এমন কি প্রত্যুষে তাহার হস্তমুখ প্রক্ষালন এবং বস্ত্র পরিধানও লোক-দেখানোর জন্য ঘটিয়া

থাকে। এমতাবস্থায় সর্বসাধারণের সহিত সম্পর্কিত কার্য, যথা-সভাসমিতি সংগঠন ও ইহাতে যোগদান, শিক্ষাদান, হাদীস-বর্ণনা প্রভৃতি কার্য ইখ্‌লাসের সহিত বিশুদ্ধভাবে কেবল আল্লাহ্‌র জন্য নির্বাহ করা যেমন দুঃসাধ্য এমন দুঃসাধ্য কাজ আর নাই। ইহার কারণ এই যে, জনসাধারণের সহিত সম্পর্কিত কাজ অধিকাংশ স্থলে লোকের নিকট ভক্তিভাজন হওয়ার জন্যই নির্বাহ করা হয় অথবা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের আশাও ইহার সঙ্গে জড়িত থাকে। শেষোক্ত স্থলে লোকের ভক্তিভাজন হওয়ার ইচ্ছা এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের আশা সমান সমান হইয়া পড়ে; বা সমান সমান না হইয়া কমবেশী হইলেও দুইটি উদ্দেশ্যের মিশ্রণ অবশ্যই ইহাতে থাকিয়া যায়।

লোকের প্রশংসা ও ভক্তি অর্জনের ইচ্ছা হইতে নিয়তকে নিষ্কলঙ্ক রাখা অধিকাংশ আলিমের পক্ষেও সম্ভবপর হইয়া উঠে না। কিন্তু কোন কোন নির্বোধ লোক নিজকে মুখলেস অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কার্য নির্বাহকারী মনে করিয়া ধোঁকায় পড়িয়া রহিয়াছে। তাহারা নিজেদের রোগ চিনিতে পারে না। মূর্খদের কথাই বা কেন বলি? বহু সুনিপুণ বুদ্ধিমান ব্যক্তিও এই বিষয়ে নিতান্ত হতবুদ্ধি ও অক্ষম হইয়া পড়ে। এক বুযুর্গ বলেন ঃ "আমি ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত জামা'আতের প্রথম সারিতে দাঁড়াইয়া যে-নামায পড়িয়াছিলাম উহা পুনরায় পড়িয়া লইলাম। ইহার কারণ এই যে, একদিন নামাযে আসিতে কিছু বিলম্ব ঘটিয়াছিল বলিয়া শেষের সারিতে স্থান পাইলাম। তখন আমি এই ভাবিয়া লজ্জিত হইলাম যে, লোকে বলিবে আমি বিলম্বে আসিয়াছি। ইহাতে আমি বুঝিতে পারিলাম, ইতঃপূর্বে আমার মনে নামাযের জন্য যে-আনন্দ ছিল তাহা কেবল এইজন্য জন্মিয়াছিল যে, লোকে আমাকে প্রথম সারিতে দেখিতে পাইবে।"

মোটের উপর কথা এই যে, ইখ্‌লাস এমন এক মানসিক সুক্ষ্ম ভাব যাহা বুঝিতে পারাই কঠিন। এমতাবস্থায় তদনুসারে কার্য করা যে কেমন কঠিনতম ব্যাপার, তাহা বর্ণনাতীত। ইবাদত ইখ্‌লাস ব্যতীত একাধিক উদ্দেশ্যে ঘটিলে কখনই কবূল হয় না। বুযুর্গগণ বলেন–"আলিমের দুই রাকাত নামায মূর্খের সমস্ত বৎসরের ইবাদত অপেক্ষা উত্তম।" কারণ, কি দোষে ইবাদত নষ্ট হয়, মুর্খগণ তাহা জানে না এবং সদুদ্দেশ্যের সহিত প্রবৃত্তি অভিলাষ কিরূপে মিলিত হয় তাহাও বুঝিতে পারে না। স্বর্ণের মধ্যে যেমন মেকি থাকে, ইবাদতের

মধ্যেও তদ্রূপ ভুয়া ইবাদত থাকে। মূর্খেরা হরিদ্রাবর্ণের সমস্ত ধাতুকেই যেমন স্বর্ণ বলিয়া মনে করে তদ্রূপ তাহারা সমস্ত ইবাদতকেই বিশুদ্ধ জ্ঞান করিয়া থাকে। পরিপক্ক স্বর্ণপরীক্ষক ব্যতীত অন্যে যেমন মেকি স্বর্ণকে বিশুদ্ধ বলিয়া ভ্রম করিতে পারে তদ্রূপ সুদক্ষ জ্ঞানী ব্যতীত অপর লোক বিশুদ্ধ ইবাদত নির্বাচন করতে পারে না।

ইবাদতে ইখ্‌লাস বিনষ্টকারী দোষের শ্রেণীবিভাগ– যে-সকল দোষ ইবাদতের ইখ্‌লাস বিনষ্ট করে তাহার চারিটি শ্রেণী আছে। তন্মধ্যে কোন কোনটি নিতান্ত গোপনীয় ও দুর্বোধ্য। এই কারণে বুঝিবার সুবিধার জন্য রিয়ার উদাহরণ অবলম্বনে উহার বর্ণনা করা হইবে। **প্রথম শ্রেণী**–এই শ্রেণীর দোষ অতি প্রকাশ্য। যেমন, মনে কর, এক ব্যক্তি নামায পড়িতেছে; এমন সময় অন্য লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন শয়তান সেই ব্যক্তিকে বলিতে লাগিল– "সুন্দরভাবে নামায পড়। অন্যথায় তাহারা তোমাকে তিরস্কার করিবে।" **দ্বিতীয় শ্রেণী**– শয়তানের উপরিউক্ত প্রতারণা বুঝিতে পারিয়া সেই ব্যক্তি যদি অপরের নিন্দা পরিহারের চেষ্টায় স্বীয় নামায সুন্দর করিয়া না দেখায়, তবে শয়তান অন্য প্রকারে তাহাকে বুঝাইতে থাকে–"তুমি সুন্দরভাবে নামায সম্পন্ন কর। তাহা হইলে এই সকল লোক তোমার অনুসরণ করিবে এবং তুমি ইহার সওয়াব পাইবে।" শয়তানের এইরূপ কুপরামর্শে হয়ত সেই নামাযী ধোঁকায় পতিত হইবে। সে বুঝিতে পারিবে না যে, যখন অন্তর-রাজ্যে দীনতাভাব পূর্ণমাত্রায় আবির্ভূত হয় এবং ইহার আলোক অপরের অন্তরেও বিকীর্ণ হইয়া যায় তখন যদি লোকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহার অনুকরণ করে তবে, দৃষ্টান্ত-স্থাপক হিসাবে সে সওয়াব পাইবে। সেই ব্যক্তির অন্তরে দীনতা-হীনতার ভাব আবির্ভূত না হইয়া থাকিলে লোকে যদি তাহাকে তদ্রূপ মনে করিয়া তাহার অনুকরণ করে তবে তাহারাও সওয়াব পাইবে; কিন্তু সেই ব্যক্তি কপটতার দোষে দায়ী হইবে। **তৃতীয় শ্রেণী**– সেই ব্যক্তি বুঝিতে পারিয়াছে যে, নির্জনে একাকী যে-নামায সম্পন্ন হয় তাহা লোক-সম্মুখে প্রকাশ্যভাবে সম্পাদিত নামায হইতে কিছু পার্থক্য ঘটিলে কপটতা হয়। এই ভয়ে সে নির্জনে একাকী উত্তমরূপে নামায পড়িতে যত্নবান হয় যেন সে লোকের সাক্ষাতে প্রকাশ্যভাবেও তদ্রূপ নামায পড়িতে পারে। ইহাতে নিহিত দোষ অত্যন্ত গোপনীয় এবং তন্মধ্যে সামান্য রিয়ার ভাবও রহিয়াছে। কিন্তু এই রিয়া কেবল তাহার নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কেননা জামা'আতে যেমন সুন্দররূপে সে নামায পড়ে, নির্জনে একাকী

সেইভাবে নামায না পড়িতে সে নিজে নিজেই লজ্জাবোধ করে। এইজন্য লোকসম্মুখে উত্তমরূপে নামায পড়িবার উদ্দেশ্যে সে নির্জনেও উত্তমরূপে নামায পড়ে এবং মনে করে যে, সে প্রকাশ্য রিয়া হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে। কিন্তু আল্লাহ্‌র জন্য লজ্জা না করিয়া নিজের জন্য নির্জন ও প্রকাশ্য নামাযে পার্থক্য করিতে লজ্জা করায় বাস্তবপক্ষে সে নির্জনে রিয়াকার হইয়াছে। **চতুর্থ শ্রেণী**–এই শ্রেণীর দোষ নিতান্ত গুপ্ত ও দুর্বোধ্য। সেই নামাযী ব্যক্তি বুঝে যে, নির্জনে হউক, কি প্রকাশ্য হউক লোকের মনোরঞ্জনের জন্য দীনতা-হীনতা অবলম্বন করা বৃথা। তখন শয়তান ফাঁকি দিয়া বলিতে থাকে–"প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব অনুধাবন কর। তুমি বুঝিতে পারিতেছ না কাহার সম্মুখে তুমি দণ্ডায়মান হইয়াছ।" শয়তানের এই কথা শুনিয়া সেই ব্যক্তি বিনয় অবলম্বন করে এবং লোকের দৃষ্টিতে দোষমুক্ত দেখায়। কিন্তু এই ভাবটি যদি নির্জনে একাকী নামাযের সময় তাহার মনে না আসিয়া কেবল প্রকাশ্য নামাযের সময় উদিত হয়, তবে বুঝা যাইবে যে, রিয়ার কারণেই ইহার উদ্ভব হইয়াছে।

কিয়ামতের দিন মহাবিচার কালে কেহই কাহারও উপকারে আসিবে না। সেই সংকটময় মুহূর্তের কথা স্মরণ হইলে মানব রিয়ার আপদ হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে। মানুষের দৃষ্টি ও চতুষ্পদ জন্তুর দৃষ্টি তোমার নিকট সমান বোধ হওয়া আবশ্যক। উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য বোধ হইলেও তুমি রিয়াশূন্য হইতে পারিবে না। এই স্থলে উল্লিখিত রিয়ার দৃষ্টান্ত সমূহের ন্যায় উক্ত উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যেও শয়তানের নানাপ্রকার ধোঁকা রহিয়াছে। এই সকল সূক্ষ্ম বিষয় বুঝিতে অক্ষম ব্যক্তি ইবাদতের পুণ্য হইতে বঞ্চিত থাকে। সে পরিশ্রম করিয়া জীবনপাত করে; তাহার যাবতীয় কাজ বিনষ্ট হইয়া যায়। এমন ব্যক্তি সম্বন্ধেই আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَالَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ –

অর্থাৎ "তাহারা যাহা কল্পনাও করে নাই, তাহা তাহাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট হইতে প্রকাশিত হইয়া পড়েবে।" (সূরা যুমর, ৫ রুকূ, ২৪ পারা)

নিয়তে আবিলতার তারতম্যানুসারে প্রতিদান-ব্যবস্থা–নিয়তে যদি মিশ্রণ থাকে এবং তন্মধ্যে রিয়া বা অপর কোন উদ্দেশ্য ইবাদতের সংকল্প অপেক্ষা প্রবল হয়, তবে ইবাদতকারী শাস্তির উপযুক্ত হইবে। কিন্তু উভয় উদ্দেশ্য সমান সমান হইলে সেই ব্যক্তি শাস্তি বা পুরস্কার কিছুই পাইবে না। পক্ষান্তরে রিয়ার

ভাব দুর্বল থাকিলে আশা করা যায় ইবাদত একেবারে নিষ্ফলে যাইবে না, যদিও হাদীসের মর্মে বুঝা যায়, ইবাদতের নিয়তের মধ্যে প্রবৃত্তিমূলক স্বার্থপরতা মিশ্রিত হইয়া উহার বিশুদ্ধতা নষ্ট করিলে আল্লাহ্‌র আদেশ হইবে–"যাহার উদ্দেশ্যে এই ইবাদত করিয়াছ, তাহার নিকট ইহার পুরস্কার চাহিয়া লও।" আমাদের মতে এই আদেশ এমন ইবাদত সম্বন্ধে প্রদত্ত হইবে যাহার মধ্যে উক্ত উভয় প্রকার উদ্দেশ্য সমান সমান থাকে। অবশ্য এমন ইবাদতে পুণ্য পাওয়া যাইবে না। এরূপ স্থলেই বান্দা ইবাদতের পুরস্কার চাহিলে আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে উক্ত প্রকার আদেশ হইবে। যে-সমস্ত কার্যের উদ্দেশ্যের মধ্যে সম্পূর্ণই রিয়া বা রিয়ার ভাব অধিক থাকে সেই সকল কার্যের জন্যই হাদীসে শাস্তির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের ইচ্ছা যদি ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য হয় এবং তৎসঙ্গে রিয়া ও অন্য কোন প্রবৃত্তিমূলক স্বার্থপরতার সংকল্প দুর্বল থাকে তবে আশা করা যায় যে, তাহাতে বিশুদ্ধ সংকল্পকৃত ইবাদতের ন্যায় তত পুণ্য না পাওয়া গেলেও সংকল্পের বিশুদ্ধতার অনুপাতে সওয়াব পাওয়া যাইবে। দুইটি দলীলে নির্ভর করিয়া এই কথা বলা হইল। **প্রথম দলীল**–বহু দলীল দ্বারা পরিষ্কারভাবে জানা গিয়াছে যে, আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভের উপযোগী গুণ হইতে বঞ্চিত হইলে এক বিষম পর্দানলে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে হইবে এবং ইহার নামই শাস্তি। আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য পাইবার আশা সৌভাগ্যের বীজ এবং দুনিয়া অর্জনের লালসা দুর্ভাগ্যের হেতু। এই দুইটি আকাঙ্ক্ষাকে মনে স্থান দিলে একটি আকাঙ্ক্ষা মনকে আল্লাহ্‌র দিকে আকর্ষণ করে এবং অপরটি তাহা হইতে দূরে লইয়া যায়। এমতাবস্থায় দুইটি আকাঙ্ক্ষার শক্তি সমান সমান হইলে একটি যদি হৃদয়কে এক হস্ত নিকটে টানিয়া আনে, অপরটি ইহাকে ততখানি দূরে লইয়া যায়। সুতরাং উভয়ের টানাটানিতে মন পূর্বে যে-স্থানে ছিল সেই স্থানেই থাকে। কিন্তু অর্ধহস্ত পরিমাণ নিকটে আসিলে এবং এক হস্ত দূরে বিতাড়িত হইলে অর্ধহস্ত দূরবর্তী রহিয়া যায়। আবার যদি এক হস্ত পরিমাণ নিকটে আসে এবং অর্ধহস্ত দূরবর্তী হয় তবে অর্ধহস্ত পরিমাণ নিকটবর্তী হইয়া তাকে, যেমন কোন পীড়িত ব্যক্তি উষ্ণ ঔষধ সেবনের সঙ্গে সঙ্গে সেই পরিমাণ শীতল ঔষধ সেবন করিলে পরস্পর-বিরোধী শক্তি সমান সমান হওয়ায় কোন পরিবর্তন ঘটাইতে পারে না। কিন্তু ঠাণ্ডা ঔষধ অল্পমাত্রায় সেবন করিলে উষ্ণতার প্রভাব কিছু অবশিষ্ট থাকে। আবার ঠাণ্ডা ঔষধ অধিক পরিমাণে সেবন করিলে উষ্ণতা লুপ্ত

হইয়া কিছু শীতলতা বৃদ্ধি করে। শরীরের পীড়া ও স্বাস্থ্যের উপর ঔষধের প্রভাব যেরূপ, আত্মার উজ্জ্বলতা ও মলিনতার সম্বন্ধে পাপ ও পুণ্যের প্রভাব ঠিক তদ্রূপ। পাপ এবং পুণ্য রেণু পরিমাণও বিনষ্ট হইবে না। মহাবিচারের দিনে ন্যায়ের নিক্তিতে ইহাদের কমবেশী প্রকাশ পাইবে। এই মর্মেই আল্লাহ্ বলেন ঃ "অনন্তর যে-ব্যক্তি রেণু পমিাণ সৎকার্য করিবে সে তাহা দেখিতে পাইবে এবং যে-ব্যক্তি রেণু পরিমাণ মন্দ কার্য করিবে সে তাহা দেখিতে পাইবে।" (সূরা যিল্যাল, ৩০ পারা।) মোটেই উপর কথা এই যে, আল্লাহ্র জন্য যে-কার্য করা হয় ইহাতে রিয়া বা অপর প্রবৃত্তিমূলক স্বার্থ যেন মিশ্রিত হইতে না পারে তজ্জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা বুদ্ধিমানের কার্য। অসম্ভব নহে যে, সদুদ্দেশ্যের সঙ্গে মিশ্রিত প্রবৃত্তিমূলক স্বার্থ প্রবল হওয়া সত্ত্বেও লোকে ইহাকে দুর্বল মনে করে। সুতরাং সৎকার্যকে নির্দোষ রাখিতে হইলে, ইহার উদ্দেশ্যের সঙ্গে প্রবৃত্তিমূলক স্বার্থ মিশিতে দেওয়াই উচিত নহে। **দ্বিতীয় দলীল**–সর্ববাদিসম্মত মত এই যে, কেহ যদি আল্লাহ্র জন্য হজ্বে যাইবার পথে ব্যবসায়ের ইচ্ছা করে তবে আদিম ও মূল উদ্দেশ্যটি হজ্বের জন্য থাকায় এবং ব্যবসায়ের ইচ্ছা পরে ইহার অনুগতভাবে উদ্ভব হওয়ায় হজ্বের পুণ্য একেবারে নষ্ট হইবে না। তবে বিশুদ্ধ উদ্দেশ্যে হজ্ব করিলে যত পুণ্য হইত তত পুণ্য অবশ্যই সেই ব্যক্তি পাইবে না। আবার মনে কর, কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে জিহাদের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে এবং দুই দিকে জিহাদ আরম্ভ হইয়াছে। এক দিকে বিরোধী দলের কাফিরগণ ধনবান। সেই দিকে গেলে জয়লব্ধ ধন অধিক পাওয়া যাইতে পারে। অপর দিকের কাফিরগণ দরিদ্র। এমতাবস্থায় সেই ব্যক্তি যদি ধনী কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করিতে যায় তবে তাহার সমস্ত পুণ্য নষ্ট হইবে না। কারণ আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে জিহাদ করা তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য; কেবল জয়লব্ধ ধন পাওযা ও না পাওয়ার মধ্যে সে পার্থক্য করিতেছে। মানব অন্তরে এইরূপ পার্থক্য-জ্ঞান থাকাই সম্ভব। দুর্ভাগ্যক্রমে জয়লব্ধ ধন জিহাদের শর্ত হইলে সওয়াব পাওয়ার সন্দেহ থাকে। কেননা, এইরূপ শর্তের উপর কোন সৎকার্যই দুরস্ত নহে; বিশেষত শিক্ষার মজলিস, গ্রন্থ-প্রণয়ন প্রভৃতি যে-সকল সৎকার্য সাধারণের সহিত সম্পর্ক রাখে, উহা তদ্রূপ শর্তের সহিত দুরস্ত হয় না। ইহার কারণ এই যে, আল্লাহ্ অযাচিতভাবে করুণা প্রদর্শনপূর্বক এমন ব্যক্তিকে অকস্মাৎ প্রবৃত্তির শৃঙ্খল হইতে ছিন্ন করিয়া না লইলে সে উহা হইতে অব্যাহতি পায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে কর, এক ব্যক্তির প্রণীত গ্রন্থ বা তাহার উক্তি অন্যের

নামে প্রকাশিত ও আদৃত হইতেছে জানিতে পারিলে সেই ব্যক্তির নিকট ইহা মন্দ বোধ হইতে পারে। কিন্তু আত্মগর্ব ও প্রবৃত্তিমূলক স্বার্থপরতা তাহার মধ্যে না থাকিলে সে তৎপ্রতি কোনই লক্ষ্য করিবে না এবং তজ্জন্য মনক্ষুণ্নও হইবে না।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ সিদ্‌ক

পূর্ণ সিদ্‌ক–সিদ্‌ক (সত্যপরায়ণতা) ইখ্লাসের মরতবা প্রায় সমান সমান। কিন্তু সিদ্‌কের মরতবা অতি বড়। সিদ্দীকের প্রশংসায় আল্লাহ্ বলেন ঃ

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ -

অর্থাৎ "মুমিনগণের মধ্যে এমন লোক আছে যাহারা আল্লাহ্র সমীপে অঙ্গীকার করিয়া তাহা পূর্ণভাবে পালন করিয়াছে।" (সূরা আহযাব, ৩ রুকূ, ২১ পারা।)

আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন لِيَسْئَلَ الصّٰدِقِيْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ – অর্থাৎ "এইজন্য যে আল্লাহ্ সত্যপরায়ণদিগকে তাহাদের সত্যপরায়ণতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবেন।" (সূরা আহ্যাব, ১ রুকূ, ২১ পারা।) লোকে রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল–"মানব কোন বিষয় অবলম্বনে চরম উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে?" তিনি বলেন– "সত্য কথন ও সত্যানুষ্ঠানে।" প্রত্যেকেরই সিদ্‌কের অর্থ জানা আবশ্যক। সত্যপরায়ণতাকে "সিদ্‌ক" বলে। ছয়টি বিষয়ে সত্যপরায়ণতা রক্ষা করিতে হয়। যে-ব্যক্তি নিম্নের ছয় বিষয়ে পূর্ণমাত্রায় সত্যপরায়ণতা রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন, তাঁহাকে 'সিদ্দীক' বলে।

প্রথম বিষয়–বচন। অতীত ঘটনা বর্ণনাকালে বা বর্তমান নূতন বিষয়ের সংবাদ প্রদানে কিংবা ভবিষ্যত বিষয়ের অঙ্গীকার করণে কিছুমাত্র মিথ্যা না বলিয়া নিরবচ্ছিন্ন সত্য বলা। কারণ ইতঃপূর্বে বলা হইয়াছে যে, হৃদয় অতি সহজে বাক্যের দোষগুণ গ্রহণ করে–কুটিল কথা বলিলে হৃদয় বক্র হইয়া পড়ে এবং সত্য কথা বলিলে হৃদয় সরল হয়। (বিনাশন ঃ প্রথমার্ধ, তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। দুইটি উপায়ে বাচনিক সত্যপরায়ণতা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। (১) ব্যাজবাক্যও না বলা। অর্থাৎ কথা বাস্তবিক সত্য হইলেও শ্রোতা যদি অন্য অর্থ বুঝে তবে রূপকভাবে সংকুচিত বাক্য ব্যবহার না করা। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে

ঝগড়া বাধিলে কিংবা মুসলমান মুসলমানে মনোমালিন্য ঘটিলে বা এইরূপ যে-স্থলে খোলাখুলি সত্য বলিতে গেলে বিবাদ বৃদ্ধির আশঙ্কা থাকে সেই স্থলে বিবাদ-মীমাংসার উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলার বিধান থাকিলেও সত্যের পূর্ণতা লাভেচ্ছুক সিদ্দীকগণের পক্ষে যথাসম্ভব ব্যাজবাক্য বলাই উচিত; পরিষ্কার মিথ্যা বলা কখনই সঙ্গত নহে। অর্থাৎ সত্য কথা সংকুচিত করিয়া রূপকভাবে বলা উচিত যেন শ্রোতা ইহার অর্থ তাহার অনুকূলে ভুল বুঝিয়া লয়। তবে সর্বদা সত্য বলা যাহার প্রকৃতির অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে, তেমন সত্যবাদী ব্যক্তি যদি আল্লাহর উদ্দেশ্যে মানবজাতির হিতকামনার সদুদ্দেশ্যে বাধ্য হইয়া মিথ্যা বলেন তবে তিনি সিদ্দীকের শ্রেণী হইতে বহির্গত হইয়া পড়িবেন না। (২) আল্লাহর নিকট প্রার্থনাকালে মনে পূর্ণ সত্যবাদী থাকা। যখন বলিবে وَجَّهْتُ وَجْهِيَ (স্বীয় মুখ ফিরাইলাম) তখন যেন তোমার হৃদয়ের মুখ সংসারের সর্ববিধ বস্তু ও অবস্তু হইতে ফিরিয়া একমাত্র আল্লাহর দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। অন্যথায় তোমার উক্তি মিথ্যা হইবে। আবার যখন বলিলে اِيَّاكَ نَعْبُدُ (অর্থাৎ আমি তোমারই দাস এবং তোমারই দাসত্ব করিতেছি), তখন যদি তুমি দুনিয়া বা দুনিয়ার লোভ-লালসাদির শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাক এবং প্রবৃত্তিকে তোমার অধীন করিতে না পারিয়া বরং তুমি নিজেই প্রবৃত্তির অধীন হইয়া পড়, তবে তোমার এইরূপ বলা মিথ্যা হইবে। কারণ, যে ব্যক্তি যাহার অধীনে থাকে, সে তাহারই দাস বলিয়া পরিগণিত হয়। এইজন্যই রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"দিরহাম ও দীনারের দাস নিতান্ত হীন ও তুচ্ছ।" কেবল স্বর্ণ-রৌপ্যাদি ধনৈশ্বর্যের কথাই বা কেন, মানব যে পর্যন্ত সংসারের সর্ববিধ আসক্তি হইতে মুক্ত হইয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন হইতে না পারিবে, সেই পর্যন্ত সে আল্লাহ্‌র দাসরূপে পরিগণিত হইতে পারিবে না। সংসারের সর্ববিধ আসক্তি হইতে মুক্তি তখনই পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় যখন মানুষ স্বীয় প্রবৃত্তি হইতেও একেবারে মুক্ত হয় এবং অহংভাব সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া যায়; এমন কি তাহার কোন ইচ্ছাই না থাকে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত যাবতীয় বস্তুর আকাঙ্ক্ষা তাহার হৃদয় হইতে বিলীন হইয়া যায় ও আল্লাহ্ যেভাবেই রাখেন, তাহাতেই সে সন্তুষ্ট থাকে। আল্লাহ্‌র বন্দেগিতে ইহাই সত্যপরায়ণতার চরম বিকাশ। যে ব্যক্তি এই উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই, তাহাকে সিদ্দীক বলা দূরের কথা, তাহাকে সত্যবাদীও বলা চলে না।

দ্বিতীয় বিষয়– নিয়ত (সংকল্প) যে-কার্য দ্বারা আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভের আশা থাকে তন্মধ্যে আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কিছু পাইবার ইচ্ছা না রাখা। কার্যের উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্য কিছু শরীক করিয়া না লওয়াকে ইখ্‌লাস বলে। আবার ইখ্‌লাসকে সিদ্‌কও বলা হয়। কেননা ইবাদতের উদ্দেশ্যের মধ্যে আল্লাহর নৈকট্য লাভের বাসনার সহিত অন্য আশা মনে থাকিলে সেই ব্যক্তি নিয়ত সম্বন্ধে মিথ্যাবাদী বলিয়া গণ্য হইবে।

তৃতীয় বিষয়– সংকল্পের দৃঢ়তা। যে-ভাবে অমূলক আগ্রহকে মিথ্যা আগ্রহ এবং বলবান আগ্রহকে সত্য আগ্রহ বলা হয় তদ্রূপ অটল সংকল্পকে সত্য সংকল্প এবং দুর্বল সংকল্পকে মিথ্যা সংকল্প বলা হইয়া থাকে। কোন কোন লোক ইচ্ছা করে–'রাজত্ব পাইলে সুবিচার করিব; ধন পাইলে সমস্তই দরিদ্রের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিব; শাসনকার্য পরিচালনায় বা শিক্ষা-দানে আমার অপেক্ষা উপযুক্ত কাহাকেও পাইলে তাহার হস্তে উহার দায়িত্ব অর্পণ করিব।' এইরূপ ইচ্ছা কখন কখন যথোচিত দৃঢ় থাকে; আবার কখন কখন দুর্বল ও অনিশ্চিত থাকে। যে-ইচ্ছাটি দৃঢ় ও অবিচলিত, ইহাকেই সংকল্পের সত্যপরায়ণতা বলে। যে-ব্যক্তির হৃদয়ে সৎকর্মের সংকল্প সর্বদা নিতান্ত বলবান থাকে তাহাকে সিদ্‌ক বলে। হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি বলিয়াছিলেন–"যে-সম্প্রদায়ে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বিদ্যমান আছেন, সেই সম্প্রদায়ে আমি নেতা হওয়া অপেক্ষা আমার মুণ্ডপাত করা আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়।" তাঁহার অন্তরে স্বীয় জীবন বিসর্জনে ধৈর্যাবলম্বনের সংকল্প অত্যন্ত বলবান ছিল বলিয়াই তিনি এইরূপ উক্তি করিয়াছিলেন। কাহারও প্রতি যদি রাজাজ্ঞা হয় যে, তুমি নিজকে অথবা হযরত আবূল বকর সিদ্দীককে (রা) হত্যা কর, তখন সেই ব্যক্তি যদি নিজের প্রাণ বাঁচাইতে চায় তবে তাহার ও হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর মধ্যে কত বড় পার্থক্য তাহা সহজেই অনুমেয়।

চতুর্থ বিষয়–অঙ্গীকার পালন। কেহ কেহ পূর্বে প্রতিজ্ঞা করিয়া রাখে যে, জিহাদ আরম্ভ হইলে যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণ বিসর্জন দিব বা উপযুক্ত নেতার আবির্ভাব হইলে তাহার হস্তে নেতৃত্ব অর্পণ করিব। কিন্তু ঠিক সময় আসিয়া উপস্থিত হইলে প্রবৃত্তি সেই অঙ্গীকার পালনে তৎপর হয় না। তাই আল্লাহ্ বলেনঃ – رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ অর্থাৎ "কতক লোক স্বীয় অঙ্গীকার পালন করিয়াছে এবং জীবন বিসর্জন দিয়াছে।" (সূরা আহ্‌যাব, ৩